বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের অধীনে
এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
তত্ত্বাবধায়ক

উপস্থাপনায়

শ্রীনাথ ফওজিয়া
গবেষক

সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

467407

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের অধীনে
এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
তত্ত্বাবধায়ক

উপস্থাপনায়

রীনাত ফওজিয়া
গবেষক

Dhak University Library
467407
467407

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

যার জন্য প্রযোজ্য

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রীনাত ফওজিয়া, রেজিস্ট্রেশন নম্বর-৭৩, শিক্ষাবর্ষ-২০০৪-২০০৫, সংগীত বিভাগে ***এম.ফিল.*** ডিগ্রির জন্য আমার অধীনে '***বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ***' শিরোনামে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে।

তাঁর অভিসন্দর্ভ -পত্র তথ্যসমৃদ্ধ ও সরজমিনে মাঠ-পর্যায়ে উপাদান সংগ্রহ করে রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে যে সকল বাদ্যযন্ত্র বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর ঐতিহাসিক পটভূমি, বিবর্তন এবং বিকাশে গুণী সংগীতজ্ঞদের ভূমিকা এবং বাদ্যন্ত্রগুলোর আধুনিক রূপ সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছে, যা এদেশের সংগীতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার ধারণা।

আমার জানামতে, অভিসন্দর্ভ-পত্রের কোনো অংশ কোথাও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়নি এবং ***এম.ফিল.*** ডিগ্রির জন্য মানসম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করি।

467407

তারিখ, ৭.১১.১০

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি ***রীনাত ফওজিয়া,*** এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ***এম.ফিল.*** গবেষণার আওতায় ***'বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ'*** গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আঙ্গিক ও বিন্যাসে নতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি, পূর্বে কোন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা কিংবা জার্নালে প্রকাশিত হয়নি। এমনকি এর অংশবিশেষও কোথাও ছাপা হয়নি। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণই আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিজ দায়িত্বে উপস্থাপন করেছি।

467407

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
রীনাত ফওজিয়া
এম.ফিল. রেজিস্ট্রেশন নং-৭৩
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৪-২০০৫
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের অধীনে
এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

রীনাত ফওজিয়া

সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

১। স্বীকৃতিপত্র

২। ভূমিকা

৩। ১ম অধ্যায় – (ক) প্রাক বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্র

(খ) বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্র

(গ) বৈদিকোত্তর যুগের বাদ্যযন্ত্র

৪। ২য় অধ্যায় – মধ্যযুগের বাদ্যযন্ত্র

৫। ৩য় অধ্যায় – আধুনিক যুগের বাদ্যযন্ত্র

৬। ৪র্থ অধ্যায় – বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ ঃ (ক) নির্মাণ উপকরণ, এর সহজলভ্যতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদান

(খ) বাদ্যযন্ত্রের আকৃতিগত পার্থক্য (শ্রেণীবিভাগ)

৭। ৫ম অধ্যায় – বাদ্যযন্ত্রের আকৃতি ও নির্মাণকৌশলের বিবরণ ঃ কালানুক্রমিক আলোচনা (বিশ্লেষণ এবং বিবর্তনের ইতিহাস)

৮। ৬ষ্ঠ অধ্যায় – বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে সংগীতজ্ঞদের ভূমিকা ও অবদান

৯। ৭ম অধ্যায় – বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তনে ঘরানার প্রভাব

১০। উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতিপত্র

গবেষণার শ্রেণীকরণ এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে স্বনামধণ্য সংগীত গুণীজনদের কাছে বিভিন্নভাবে আমি ঋণী। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাচ্ছি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীকে। আমার এম.ফিল. গবেষণার আওতায় এই অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে আমাকে দির্ঘদিন ধরে নিরলস পরামর্শ, গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্র সহায়তা, গবেষণার পদ্ধতিগত তত্ত্বাবধান করে আমাকে চিরঋণী করেছেন। বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে গবেষণা এদশে নতুন হলেও তাঁর অসীম ধৈর্য এবং উৎসাহ প্রদানের ফলেই আমার পক্ষে বিষয়ের গভীরে মনোনিবেশ করা এবং গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাচ্ছি আমার বাবা সংগীত গবেষক এবং সংগীত গ্রন্থ প্রণেতা জনাব মোবারক হোসেন খানকে তাঁর সংগীত বিষয়ক বিশাল লাইব্রেরী দিয়ে আমাকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করার জন্য। উৎসাহ প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাচ্ছি আমার মা কণ্ঠশিল্পী ফওজিয়া খানকে।

গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় সংগীত বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অংশীদার করে তোলার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার সংগীত গুরু ওস্তাদ খুরশিদ খানের কাছে।

আমার গবেষণার কাজে আন্তরিকভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আমার ছোট দুই ভাই ড. তারিফ হায়াত খান এবং তানিম হায়াত খান। তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞানাই। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞানাই আমার পুত্র তাহসিন খানকে, যে আমার গবেষণা কর্মের সার্বক্ষনিক সহযোগী ছিলো। তথ্য অনুসন্ধান করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে হাল ধরতে এগিয়ে এসেছে বারবার।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং সুরসাধক ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ সহ এদেশের বিশিষ্ট সংগীত গুণীজনদের, এদেশের বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তনে এবং উৎকর্ষ সাধনে যাঁদের অবদান অপরিসীম। বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে তাঁদের উদ্ভাবণী চিন্তাভাবনা আমাদেরকে সংগীত বিষয়ক গবেষণা করতে উৎসাহিত করবে যুগে যুগে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আমাদের দেশে যে সকল বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যায় প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক আমলে এগুলোর মূল নিহিত রয়েছে। সুপ্রাচীন আমলে ব্যবহৃত কোন কোন প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে সুর উৎপন্ন হয়ে মানুষকে বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের দিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যেমন, ধনুকের ছিলার টঙ্কার। এ থেকে সুরেলা শব্দ উৎপন্ন হয়। ক্রমে এ থেকে বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। তালযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে দূরে সঙ্কেত পাঠানোর জন্য শব্দ সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে। মাটিতে গর্ত করে চামড়ার ছাউনি দিয়ে তাতে আঘাত করে প্রাচীন মানুষ শব্দ উৎপন্ন করত। ক্রমে এ থেকে ছাউনি দেওয়া বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

এই ভূখণ্ডে প্রচলিত সবচেয়ে প্রাচীন যন্ত্রগুলোর গঠন ছিলো সরল প্রকৃতির। যেমন ধনুকের একটি তারে টোকা দিলে একটি সুর উৎপন্ন হয়। ক্রমান্বয়ে সাত তারের ধনুকাকৃতির বীণা আবিস্কৃত হলো। এর সাতটি তারে টোকা দিয়ে সাত সুর উৎপন্ন করা হয়। এর নাম সপ্ততন্ত্রী বীণা। এভাবে শততন্ত্রী বীণার উল্লেখ পাওয়া গেছে ইতিহাসে। এগুলোকে বলা হয় পলিকর্ড জাতীয় যন্ত্র, অর্থাৎ একাধিক সুরের জন্য একাধিক তার ব্যবহৃত হয় এসব যন্ত্রে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এরপরে আসে মনোকর্ড জাতীয় যন্ত্র যেখানে একটি তারের দৈর্ঘ্য আঙুলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করে বিভিন্ন সুর উৎপন্ন করা যায়। যুগের পর যুগ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা অব্যাহত থাকে। ফলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে বাদ্যযন্ত্রসমূহের গঠন, আকার এবং কাঠামো। আজকে আমাদের দেশে জনপ্রিয় যে সকল বাদ্যযন্ত্র আমরা দেখতে পাই, যেমন, সেতার, সরোদ, সারেঙ্গী, এস্রাজ, দিলরুবা, বাঁশি, তবলা বাঁয়া ইত্যাদি যন্ত্র একদিনে আসে নি। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র সমূহ বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন রূপ নেওয়ার ফলে এ সব বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাসের নিদর্শন থেকে এ বিষয়ে তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননকার্য থেকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অনেক রকমের বাদ্যযন্ত্র এবং প্রাচীন গুহাচিত্রে পাওয়া গেছে বাদ্যযন্ত্রের ছবি।

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে এদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি, প্রচলন ও ক্রমবিবর্তন ছিলো বর্তমান গবেষকের গবেষণার বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিকোত্তর প্রাচীন যুগে ভরত, মতঙ্গ, নারদ প্রমুখ বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক এবং সংগীতজ্ঞ রচিত গ্রন্থাবলি থেকে সংগীতের বিবরণের সাথে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া গেছে। মধ্যযুগ এবং তার পরবর্তী সময়ের সংগীতের বিবরণ ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে কোথাও আলোকপাত করা হয় নি। তাই ***"বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ"*** বর্তমান গবেষকের অভিসন্দর্ভের বিষয় এবং এতে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের আকার ও কাঠামো বিশ্লেষণ করে ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারা বিবৃত করা হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে সংগীতচর্চা চলে এসেছে। কণ্ঠসংগীতের পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্রের চর্চা এদেশে সবসময় বজায় ছিলো। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাসের প্রামাণ্য নিদর্শনসমূহ ধারাবাহিকভাবে আমাদের হাতে এসে পৌছায় নি। ফলে বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্‌ঘাটন বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। বিষয়টা মেনে নিয়েই উল্লিখিত সূত্রগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত, চিত্র ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি, প্রচলন ও ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে প্রাক বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্র, বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্র এবং বৈদিকোত্তর যুগের বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মধ্যযুগের বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আধুনিক যুগের বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এ অধ্যায়কে দু'টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে,

(ক) নির্মাণ উপকরণ, এর সহজলভ্যতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদান

(খ) বাদ্যযন্ত্রের আকৃতিগত পার্থক্য (শ্রেণীবিভাগ)

পঞ্চম অধ্যায়ে বাদ্যযন্ত্রের আকৃতি ও নির্মাণকৌশলের বিবরণের কালানুক্রমিক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে সংগীতজ্ঞদের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কিত আলোচনা।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তনে ঘরানার প্রভাব।

পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকার নাম এবং ইন্টারনেটের তথ্য উৎসের ঠিকানা।

অভিসন্দর্ভটিতে বানানের ক্ষেত্রে আধুনিক রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে উদ্ধৃতিগুলোতে পূর্বসূরী লেখকদের নিজস্ব রীতি রাখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে যে সকল বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যায় প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক আমলে এগুলোর মূল নিহিত রয়েছে। প্রাচীন যন্ত্রগুলোর গঠন ছিলো সরল প্রকৃতির। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে তা থেকে উন্নততর বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। ইতিহাস বিশ্লেষনে জানা গিয়েছে প্রাথমিক যুগের বাদ্যযন্ত্রগুলোর বাদন পদ্ধতিও ছিলো সরল প্রকৃতির। তারের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুরে ভিন্নতা আনার উপায় জানা ছিলো না। পরীক্ষা এবং নিরীক্ষার মাধ্যমে সে উপায় আবিস্কৃত হয়। ফলশ্রুতিতে উদ্ভাবিত হয় সেতার, সরোদ, এস্রাজ, বেহালা প্রভৃতি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র সমূহ বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন রূপ নেওয়ার ফলে এ সব বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। এই বিবর্তনের প্রতি বর্তমান গবেষণাপত্রে আলোকপাত করা হয়েছে। যুগে যুগে নিবিড়ভাবে বাদ্যযন্ত্রের চর্চা করার ফলে বাদকদের নিজস্ব বাদনশৈলী সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন ঘরানা। বিভিন্ন ঘরানার কুশলী বাদকদের হাতে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং মানোন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ বিষয়েও বর্তমান গবেষণাপত্রে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ক্রমে বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান গবেষণাপত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশে যে সকল বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যায় প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক আমলে এগুলোর মূল নিহিত রয়েছে। প্রাচীন যন্ত্রগুলোর গঠন ছিলো সরল প্রকৃতির। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে তা থেকে উন্নততর বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। ইতিহাস বিশ্লেষনে জানা গিয়েছে প্রাথমিক যুগের বাদ্যযন্ত্রগুলোর বাদন পদ্ধতিও ছিলো সরল প্রকৃতির। তারের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুরে ভিন্নতা আনার উপায় জানা ছিলো না। পরীক্ষা এবং নিরীক্ষার মাধ্যমে সে উপায় আবিস্কৃত হয়। ফলশ্রুতিতে উদ্ভাবিত হয় সেতার, সরোদ, এস্রাজ, বেহালা প্রভৃতি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র সমূহ বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন রূপ নেওয়ার ফলে এ সব বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। এই বিবর্তনের প্রতি বর্তমান গবেষণাপত্রে আলোকপাত করা হয়েছে। যুগে যুগে নিবিড়ভাবে বাদ্যযন্ত্রের চর্চা করার ফলে বাদকদের নিজস্ব বাদনশৈলী সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন ঘরানা। বিভিন্ন ঘরানার কুশলী বাদকদের হাতে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং মানোন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ বিষয়েও বর্তমান গবেষণাপত্রে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ক্রমে বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান গবেষণাপত্রে।

এই ভূখণ্ডে প্রচলিত সবচেয়ে প্রাচীন যন্ত্রগুলোর গঠন ছিলো সরল প্রকৃতির। যেমন ধনুকের একটি তারে টোকা দিলে একটি সুর উৎপন্ন হয়। ক্রমান্বয়ে সাত তারের ধনুকাকৃতির বীণা আবিস্কৃত হলো। এর সাতটি তারে টোকা দিয়ে সাত সুর উৎপন্ন করা হয়। এর নাম সপ্ততন্ত্রী বীণা। এভাবে শততন্ত্রী বীণার উল্লেখ পাওয়া গেছে ইতিহাসে। এগুলোকে বলা হয় পলিকর্ড জাতীয় যন্ত্র, অর্থাৎ একাধিক সুরের জন্য একাধিক তার ব্যবহৃত হয় এসব যন্ত্রে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এরপরে আসে মনোকর্ড জাতীয় যন্ত্র যেখানে একটি তারের দৈর্ঘ্য আঙুলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করে বিভিন্ন সুর উৎপন্ন করা যায়। যুগের পর যুগ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা অব্যাহত থাকে। ফলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে বাদ্যযন্ত্রসমূহের গঠন, আকার এবং কাঠামো। আজকে আমাদের দেশে জনপ্রিয় যে সকল বাদ্যযন্ত্র আমরা দেখতে পাই, যেমন, সেতার, সরোদ, সারেঙ্গী, এস্রাজ, দিলরুবা, বাঁশি, তবলা বাঁয়া ইত্যাদি যন্ত্র একদিনে আসে নি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র সমূহ বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন রূপ নেওয়ার ফলে এ সব বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাসের নিদর্শন থেকে এ বিষয়ে তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননকার্য থেকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অনেক রকমের বাদ্যযন্ত্র এবং প্রাচীন গুহাচিত্রে পাওয়া গেছে বাদ্যযন্ত্রের ছবি।

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে এদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি, প্রচলন ও ক্রমবিবর্তন ছিলো বর্তমান গবেষকের গবেষণার বিষয়।

বৈদিকোত্তর প্রাচীন যুগে ভরত, মতঙ্গ, নারদ প্রমুখ বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক এবং সংগীতজ্ঞ রচিত গ্রন্থাবলি থেকে সংগীতের বিবরণের সাথে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া গেছে। মধ্যযুগ এবং তার পরবর্তী সময়ের সংগীতের বিবরণ ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে কোথাও আলোকপাত করা হয় নি।তাই ***"বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ"*** বর্তমান গবেষকের অভিসন্দর্ভের বিষয় এবং এতে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের আকার ও কাঠামো বিশ্লেষণ করে ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারা বিবৃত করা হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে সংগীতচর্চা চলে এসেছে। কণ্ঠসংগীতের পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্রের চর্চা এদেশে সবসময় বজায় ছিলো। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাসের প্রামাণ্য নিদর্শনসমূহ ধারাবাহিকভাবে আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় নি। ফলে বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্‌ঘাটন বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। বিষয়টা মেনে নিয়েই উল্লিখিত সূত্রগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত, চিত্র ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি, প্রচলন ও ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের অধীনে
এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
রীনাত ফওজিয়া
এম.ফিল. রেজিস্ট্রেশন নং-৭৩
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৪-২০০৫
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায় - প্রাক বৈদিক, বৈদিক এবং বৈদিকোত্তর যুগের বাদ্যযন্ত্র

যে বস্তুতে আঘাত করলে সুরযুক্ত শব্দ বের হয় তাকে বাদ্য বলে। 'বাদন' শব্দ থেকে 'বাদ্য' শব্দের উৎপত্তি। বাদন শব্দের মূল ধাতু 'বাদ' অর্থ হচ্ছে 'বলা'। কাজেই বাদ্যযন্ত্র বাদন বলতে বোঝায় বাদ্যযন্ত্রকে দিয়ে কথা বলানো। সুতরাং যে যন্ত্রটি কথা বলতে পারে অর্থাৎ ধ্বণি উৎপন্ন করতে পারে তাকে বলা হয় 'বাদ্য(যন্ত্র)'।[১] তবে শুধু ধ্বণি উৎপন্ন করলেই সুর হবে না। সব শব্দ বা সব ধ্বণিই সুর নয়। বাদ্যযন্ত্রেও শব্দ বা ধ্বণিতে সুর থাকতে হবে। কাজেই যে জিনিস থেকে সংগীতের উপযোগী শব্দ উৎপন্ন হয় তাকে বাদ্যযন্ত্র বলা যায়।[২]

শব্দ সৃষ্টি হয় কম্পন থেকে। কোন বাদ্যযন্ত্রের তারে কম্পন সৃষ্টি হলে তার চারপাশের বাতাস কাঁপতে থাকে। অর্থাৎ বাতাসে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তা চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাতাসের এই কম্পন আমাদের কানে এসে পৌছায় এবং তা আমাদের কানের পর্দা এবং হাড়ে কম্পন সৃষ্টি করে। সেখান থেকে স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে সংকেত পৌছলে আমরা শব্দ শুনতে পাই। কাজেই কম্পন সব শব্দের মূল উৎস, কম্পন ছাড়া কোন শব্দ হবে না।

তবে এই কম্পন হতে হবে নিয়মিত। অনিয়মিত কম্পন থেকে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাকে সুর বলা যায় না। কম্পন যখন নিয়মিত হয় এবং তা কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় তখন তা থেকে সুর উৎপন্ন হয়। [৩]

তারের যন্ত্রে টোকা দিলে তারে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং সেই কম্পন ছড়িয়ে পড়ে। ঢাক বা ঢোলের পর্দায় আঘাত করলে পর্দায় যে কম্পন সৃষ্টি হয় তা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁশিতে ফুঁ দিলে বাঁশির ভেতরকার বায়ুস্তম্ভতে কম্পনের সৃষ্টি হয়, যা থেকে সুর সৃষ্টি হয়ে আমাদের কানে এসে পৌছায়। এভাবে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বিভিন্নভাবে সুর উৎপন্ন করে শ্রোতার মনোরঞ্জন করে থাকে।

বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আকৃতিগত এবং সুরগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র এদেশে প্রচলিত। কালের বিবর্তনে বাদ্যযন্ত্রের অবয়বে আকৃতিগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের সাথে সুরের পার্থক্যও দেখা যায়। তাছাড়া কালের বিবর্তনে নতুন বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভবও পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাস জানতে হলে এদেশের ইতিহাস প্রথমে জানতে হবে। কারণ এদেশের ইতিহাসের উপর এই অঞ্চলের সংগীতের ইতিহাস নির্ভরশীল। তবে একটি কথা উল্লেখ করা খুব দরকার, তা হলো, মাত্র একশ বছর আগেও আমাদের দেশ এবং প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ নিয়ে গঠিত ছিলো সমগ্র ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশ। উপমহাদেশ বলতে যা বোঝাতো সেখানে এখন কয়েকটি স্বাধীন দেশের অবস্থান। এই সব ক'টি দেশেরই সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গেলে অভিন্ন ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়।

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী এদেশের সংগীতের ক্রমবিকাশকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।[৪] যেমন,

১. প্রাক বৈদিক যুগ (সিন্ধু সভ্যতা) ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল পর্যন্ত।
২. বৈদিক যুগ (প্রাচীন যুগ) ঃ খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সাল পর্যন্ত।
৩. বৈদিকোত্তর যুগ ঃ খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
৪. মধ্যযুগ ঃ ১২০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
৫. আধুনিক যুগ ঃ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

যুগের পরিসংখ্যানে আবদ্ধ করলেও প্রতিটি যুগ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, একটি যুগের অর্জনের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে পরবর্তী যুগের সফলতা। সিন্ধু সভ্যতা বা প্রাক বৈদিক যুগে যে বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলোই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এদেশের যন্ত্রসংগীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এসকল বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ এবং পরিবেশন রীতিতে এদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) প্রাক বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্র ঃ

সিন্ধু উপত্যকায় খননকার্যের ফলে সেখানকার সুপ্রাচীন সভ্যতা, শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অভাবনীয় ইতিহাসের দ্বার উন্মোচন হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা আবিস্কারের আগে পর্যন্ত বৈদিক সভ্যতাকেই সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা মনে করা হতো। কিন্তু ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদারো এবং অবিভক্ত পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে আগের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ প্রথমবার সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খননকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন স্যার জন মার্শাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী প্রমুখ। তাঁদের মতে সিন্ধু সভ্যতা প্রাক বৈদিক সভ্যতা। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল পর্যন্ত সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো বলে বেশিরভাগ গবেষক একমত পোষণ করেন। সিন্ধু সভ্যতার খননকার্যের ফলে পাওয়া সংগীতের নিদর্শন থেকে সে যুগের সংগীত চর্চা এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের প্রমাণ মেলে।[৫] যদিও সিন্ধু সভ্যতা থেকে পাওয়া বিভিন্ন সংগীত উপকরণ অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র বা তার অংশবিশেষ খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া গেছে এবং এগুলো অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নি তবুও এর ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত মূল্যবান।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার খননকার্য থেকে পাওয়া গেছে বাঁশি (ভগ্নাবশেষ বা বিকৃত অবস্থায়), বীণা, চামড়ার বাদ্য ও ব্রোঞ্জের তৈরি নর্তক নর্তকীর ভগ্নমূর্তি। দ্বিতীয়বার যখন আর্নেস্ট ম্যাকে মহেঞ্জোদারোর স্তুপ খনন করেন, তখনও সেখান থেকে পাওয়া গেছে বাঁশি, বিকৃত বীণার অবয়ব ও ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীমূর্তি।[৬] গবেষকদের কাছে এই সকল উপাদান অত্যন্ত মূল্যবান, কেননা হাড়ের তৈরি সাধারণ বাঁশি, কতগুলো বীণা, চামড়ার মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্য ইত্যাদি সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় বাদ্যযন্ত্রের অনুশীলনের প্রমাণ বহন করে।

গুজরাট অঞ্চলের লোথাল খননকার্যে যে সকল সামগ্রী পাওয়া গেছে সেগুলোর সঙ্গে হরপ্পা থেকে পাওয়া জিনিসপত্রের সাদৃশ্য আছে। লোথাল আবিস্কারে সংগীত সম্পর্কিত সামগ্রীর মধ্যে কোন একটি বাদ্যযন্ত্রের ব্রিজ পাওয়া গেছে। ব্রিজের দুটি স্থানে ছিদ্র, তা থেকে অনুমান করা যায় দোতারা মত একটি বাদ্যযন্ত্রে দু'টি তার সংযুক্ত ছিলো। নাগপুর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক এস.আর.রাও ঐ ব্রিজটি আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন " A shell piece with grooves at two places, which must have

Dhaka University Institutional Repository

been used as a 'bridge' in some musical instruments. In this case we find that two strings must have been used. This shell piece is complete. It comes from the middle levels of the *Harappa culture at Lothal, datable at 2000 B.C.*" [৭]

ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট পিগট তাঁর *Pre-Historic India* গ্রন্থে (পৃঃ ২৭০) লিখেছেন -- " নৃত্যের সঙ্গে মৃদঙ্গ, বেণু বা বাঁশি, তন্ত্রীযুক্ত বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র থাকতো। এগুলো ধ্বনিত হতো সাতটি স্বরে।" [৮]

ঐতিহাসিক রায়বাহাদুর দীক্ষিত তাঁর *Pre-Historic Civilization of Indus Valley* গ্রন্থে লিখেছেন -- "Besides dancing, it appears that music was cultivated among the Indus people, and it seems probable that the earliest stringed instruments and drums (with which to keep rhythm accompaniment with the music) are to be traced to the Indus civilization. In one of the terracotta figures a kind of drum is to be seen hanging from the neck, and one of the two seals we find a precursor of the modern *mridanga* with skins on either end. Some of the pictographs appear to be representations of a crude stringed instrument, prototype of the modern *vina*; while pair of castanets, like the modern *karatala*, have also found." [৯]

(খ) বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্র ঃ

বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে বৈদিক যুগ গড়ে উঠেছিলো। গীত, নৃত্য ও বাদ্য -- সংগীতের তিনটি কলার উৎকর্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায় এ যুগের ইতিহাস থেকে।

বেদকে ভিত্তি করে আর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে বলে ধারণা করা হয়। আর্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। মোটামুটিভাবে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কে বৈদিক যুগ বলা হয়ে থাকে। আর্যদের আগমনস্থলের উৎস সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশকাল নিয়ে সকলেই একমত।

বৈদিক যুগে বেদকে কেন্দ্র করে সংগীতের একটি ধারা বিকাশলাভ করেছিলো। বেদ চার ভাগে বিভক্ত ঃ ঋক, সাম,যজু এবং অথর্ব। প্রত্যেক বেদ আবার 'সংহিতা' এবং 'ব্রাহ্মণ' এই দুই অংশে বিভক্ত। সংহিতা

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ পদ্যে রচিত, ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত। প্রতিটি শাখাকে অবলম্বন করেই বৈদিক গান বিকাশলাভ করে। প্রকৃতপক্ষে বেদের স্তোত্রগুলি সুরে পাঠ করা হতো। ঋকমন্ত্র সুর দিয়ে গাওয়ার নাম সামগান এবং এই সামগানকেই সব গানের উৎস বলে মনে করা হয়।

বৈদিক গানের সঙ্গে থাকতো নৃত্য ও বাদ্য। বৈদিক যুগের সাহিত্যে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়।

দুন্দুভি, ভূমিদুন্দুভি প্রভৃতি চামড়ার বাদ্য, বিভিন্ন ধরনের তন্ত্রীযুক্ত বীণা, বেণু প্রভৃতির উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। দুন্দুভি পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি হতো। ভূমিদুন্দুভি তৈরি করা হতো মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মুখ পশুর চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত করে। যুদ্ধে, বিপদাশঙ্কায় ও বিভিন্ন উৎসবে ঘোষণা করার জন্য দুন্দুভি ব্যবহার করা হতো। ঋগ্বেদে (১।২৮।৫) আছে ঃ "যচ্চিচদ্ধি ত্বং গৃহে - - ইহদ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভি"।

ঋগ্বেদে 'গর্গর' নামক একটি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। ৮।৬৯।৯ ঋকে আছে ঃ "অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরিসনিস্বণৎ পিঙ্গা পরি চ নিষ্কদ্‌দিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতম্।" এই মন্ত্রে 'গর্গর' ছাড়াও 'পিঙ্গ' বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। টীকাকার রমেশচন্দ্র দত্ত উল্লেখ করেছেন "গর্ গর্ ধ্বণিযুক্ত বাদ্য ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে, ... পিঙ্গলবর্ণ ধনুকের জ্যা শব্দ করিতেছে .. .. ।" পিঙ্গ যন্ত্রটি এক ধরনের ধনুর্যন্ত্র। একে রাবণাস্ত্রও বলা হতো। ধনুর্যন্ত্র পিঙ্গল বা নীলাভ তাম্রবর্ণের পশুর অন্ত্র বা নাড়ী (অধুনিক যুগে গাট স্ট্রিং নামে পরিচিত, গাট স্ট্রিংকে আধুনিক বাংলায় অন্ত্রী তার বলা হয়) দিয়ে তৈরি হতো বলে এর নাম 'পিঙ্গ'। গবেষকদের ধারণা এই পিঙ্গ যন্ত্রটিই পরে রূপ পরিবর্তন করে বেহালায় রূপান্তরিত হয়।[১০]

বেদে আঘাটি, ঘাটলিকা, কাণ্ডবীণা, নাড়ী, বনস্পতি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। ১০।১৪।২ ঋকে আঘাটির বর্ণনা আছে এরূপ ঃ "আঘাটিভিরিবধাবয়ন্নরণ্যানি মহীয়তে"। 'নাড়ী' নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ ১০।১৩৫।৭ ঋকে পাওয়া যায় ঃ "ইয়মস্য ধম্যতে নাড়ীরয়ং গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ"।

Dhaka University Institutional Repository

ঋগ্বেদে শততন্ত্রী বীণার উল্লেখ আছে। এ থেকে বোঝা যায় ঋগ্বৈদিক যুগে সামগদের (সামগান পরিবেশনকারী) মধ্যে শততন্ত্রী বীণার প্রচলন ছিলো। ১।৮৫।১০ ঋকে আছে ঃ "ধমন্তো বাণং মরুতঃ সুদানবোমদেসোমস্যরণ্যানি চক্রিরে"। বেদভাষ্যকার আচার্য সায়ন ব্যাখ্যা করছেন 'বাণ' ছিলো শততন্ত্রী বীণার অপর নাম।

সামবেদেও নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনটি কলার যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। যজুর্বেদেও একই ধরণের উল্লেখ রয়েছে। শুক্লযজুর্বেদে এবং কৃষ্ণযজুর্বেদে একাধিকবার দুন্দুভি এবং ভূমিদুন্দুভির উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ীসংহিতায় (৯।১২) 'বনস্পতি' নামক বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ "বনস্পতয়ো বিমুচ্যদ্ধম্"। বনস্পতি বলতে গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে সেই গর্তের মুখে পশুর চর্ম আচ্ছাদিত করে তৈরি যন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া তৈত্তিরীয় সংহিতায় দুন্দুভি, তুণব, বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে, বাক্ বা ধ্বনি (শব্দ) বনস্পতি, দুন্দুভি, তুণব, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ভেতর দিয়ে প্রেরিত হয়। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৫।১।৫) পুরণারীরা যে কাণ্ডবীণা বাজাতেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাজসনেয়ীসংহিতায় (৩০।১০।১৯) 'অদম্বর' নামে একটি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে ঃ "শব্দয় অদম্বর ঘাতম্"।

অথর্ববেদেও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে, যেমন, বনস্পতি, দুন্দুভি ইত্যাদি। এছাড়াও 'কর্করি' এবং 'বক্র' নামক আরো দু'টি বাদ্যযন্ত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আচার্য কর্ক তাঁর ভাষ্যে 'গোধবীণা' অর্থাৎ গোসাপের চামড়ায় আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র, 'কান্ডবীণা' ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। বেদভাষ্যকার কাত্যায়নের ব্যাখ্যায় সমসাময়িককালে মর্দল, ভেরী, পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১]

(গ) বৈদিকোত্তর যুগের বাদ্যযন্ত্র ঃ

ঐতিহাসিকদের মতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় হচ্ছে বৈদিকোত্তর যুগ। এ সময়ের মধ্যে আর্যরা ক্রমশ সমগ্র ভারতবর্ষের বুকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। সম্ভবত মধ্য এশিয়া থেকে খাইবার পাস অতিক্রম করে আর্যরা এই উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর বিস্তীর্ণ ভূখন্ডে দলে দলে গমন করে সৃষ্টি করেছিলেন নতুন নতুন জনপদ। তাঁদের প্রভাবে নতুন সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারার বিকাশ ঘটে। সমগ্র উপমহাদেশে যে ধরণের গীত, বাদ্য ইত্যাদির প্রচলন ছিলো তা এই

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙা গড়ার মধ্যে অক্ষুন্ন থাকলেও রূপে বা গঠনে ও বিকাশে এর কিছু পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে মার্গ সংগীতের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব প্রচলিত সামগানের পাশাপাশি মার্গ সংগীতের প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীকালে গান্ধর্ব সংগীত কথাটির উৎপত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও আসলে বিভ্রান্তির কোন কারণ নাই। কারণ, নাট্যশাস্ত্র রচয়িতা ভরত বলেছেন, গান্ধর্বদের প্রিয় বলে বৈদিকোত্তর মার্গ সংগীত গান্ধর্ব নামে পরিচিত। [১২]

গান্ধর্ব সামগানোত্তর হলেও এই সংগীতে সামগানের গুণ ও প্রকৃতি বিদ্যমান ছিলো। প্রকৃতপক্ষে সামগান ও গান্ধর্ব গান উভয়ই ছিলো উচ্চশ্রেণীর সংগীত, একেবারে আমজনতার পক্ষে নৈপুণ্যলাভের উপযোগী নয়। নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে গান্ধর্ব গানের পরিচয় প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন --

"যত্তুতন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানাতোদ্য সমাশয়ম্।
গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্।"

ভরত রচিত এই দু'টি পঙ্‌ক্তি থেকে বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায়। যেমন 'তন্ত্রী' শব্দের দ্বারা বীণার কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বীণাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে স্বর, তাল, পদযুক্ত সংগীতের নামই গান্ধর্ব।

আর্যদের বিস্তারিত জীবনচিত্র পাওয়া যায় সে আমলে রচিত দুটি মহাকাব্য 'রামায়ন' এবং 'মহাভারতে'। এ দুটি পুরানের রচনাকাল আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। যদিও নির্দিষ্ট কোন একটি সময়ে মহাকাব্যগুলোর রচনা শুরু এবং শেষ হয়েছে, দিন তারিখ উল্লেখ করে এমন কথা বলা যায় না। কারণ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নানা কাহিনী ক্রমান্বয়ে এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে দিনের পর দিন এগুলোর কলেবর বৃদ্ধি করেছে। প্রাচীন আমলে এসব পুরাণ আবৃত্তি করা হতো অথবা গাওয়া হতো।

রামায়নে কুশীলব যে গান গাইতেন সেটি প্রকৃতপক্ষে গান্ধর্ব সংগীতই। এতে বেণু-বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। বাল্মীকির দুই তরুণ শিষ্য লব এবং কুশের 'বীণা' বাজিয়ে সংগীত পরিবেশন সেই সত্য বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

মহাভারতেও গায়ক, বাদক, নর্তক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। সেইসাথে শঙ্খ, বেণু, মৃদঙ্গ, নয়টি তন্ত্রীযুক্ত বীণা ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

পুরাণ শ্রেণীভুক্ত এই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'হরিবংশ', যেখানে অনেকটা পরিমার্জিত সংগীত এবং নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে তুম্বী বীণা, বল্লকী মৃদঙ্গ, তূর্য, ভেরী ইত্যাদির নাম লক্ষণীয়।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সংগীতের কী রূপ ছিল তা আমরা জানতে পারি যে দুটি গ্রন্থ থেকে তা হচ্ছে নারদ রচিত 'শিক্ষা' এবং ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্র'। এই গ্রন্থ দুটি যদিও পুরোপুরি সংগীত সম্পর্কীয় নয়, তবুও উপমহাদেশের সংগীতের ক্রমবিকাশকে বুঝতে হলে গ্রন্থ দুটি অপরিহার্য।

নারদের 'শিক্ষা'ঃ

সংস্কৃত সাহিত্য ও সংগীতশাস্ত্রের কোথাও কোথাও নারদ 'গন্ধর্ব' নামে পরিচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁকে 'মুনি' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। "শিক্ষা" গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে নারদের নাম নিয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তির কারণ হচ্ছে ইতিহাসে চারজন নারদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে "শিক্ষা"র রচয়িতা আদি নারদ হিসেবে পরিচিত। পরবর্তী নারদগণ যথাক্রমে "মকরন্দ", "পঞ্চসারসংহিতা" এবং "রাগনিরূপণ" গ্রন্থের রচয়িতা।[১৩]

নারদ সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন সংগীতের সাথে তাঁর গভীর সম্পৃক্ততা ছিলো। মহাভারতের 'আদিপর্ব'তে ব্যাস বর্ণনা করেছেন – নারদ বিপুল জ্ঞানের অধিকারী। .. .. সামবেদে তাঁর অসাধারণ দখল রয়েছে এবং তিনি একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ।" এছাড়া বাদ্যযন্ত্রের সাথে নারদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় তাঁর নিজের ভাষ্যে। তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমি আমার মহতী বীণা সহযোগে গান করে সারা বিশ্বব্যাপী প্রভুর গুণ কীর্তন করে বেড়াই।[১৪] একাধিক লেখক এবং টীকাকারের রচনায় নারদের মহতী বীণার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু যন্ত্রটির স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন চিত্র পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিক সামগানের প্রকৃত রূপ ও রীতিনীতি এবং সে প্রসঙ্গে লৌকিক, মার্গ ও দেশী সংগীতের সঙ্গে বৈদিকের সম্পর্ক এবং সে সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায় নারদ রচিত শিক্ষা গ্রন্থে। গ্রন্থটি রচিত হয় খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। "শিক্ষা" মূলত ধ্বণিতত্ত্বের জন্য একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, সংগীতের স্বর, গ্রাম ও মূর্চ্ছনা সম্পর্কেও এই বইয়ে যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। সে তুলনায় অবশ্য বাদ্যযন্ত্রের কথা ততটা পাওয়া যায় না, এ বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। নারদী শিক্ষার পঞ্চম কণ্ডিকা আরম্ভ হয়েছে 'দারবী' ও 'গাত্রবীণা'র প্রসঙ্গ নিয়ে। 'শিক্ষা' গ্রন্থে এ'দুটি বীণার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। [১৫]

প্রাসঙ্গিক বিধায় এক্ষেত্রে গাত্রবীণা এবং দারবী বীণা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ প্রদান করা প্রয়োজন। বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে, মানুষের শরীরই প্রথম বাদ্যযন্ত্র। এজন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে 'গাত্রবীণা' (অথবা 'দৈবী বীণা')। [১৬] 'সংগীত মকরন্দ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ শব্দ পাঁচ ধরণের হয়ে থাকে, এর মধ্যে প্রথম চারটি আসে নখ (অথবা হাতের টোকা), বায়ু, চর্ম এবং লোহা থেকে এবং শেষোক্তটি প্রাকৃতিক অর্থাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর। [১৭] নারদী শিক্ষায় উল্লিখিত অপর বীণা হচ্ছে দারবী বীণা অর্থাৎ কাঠের বীণা (অপর নাম মানুষী বীণা বা মনুষ্যনির্মিত বীণা)। গাত্রবীণা ব্যতীত অপরাপর সকল বীণা এই গোত্রের অন্তর্গত। [১৮] এই অর্থ অনুসরণ করে বলা যায় ইতিহাসে যে সকল ধরণের বীণার নমুনা পাওয়া গেছে সেগুলো সবই এই দলভুক্ত। প্রাথমিক যুগের 'চিত্রা বীণা', 'বিপঞ্চীবীণা' অথবা 'রুদ্রবীণা', 'স্বরস্বতী বীণা' – অর্থাৎ যে যন্ত্রগুলোর তার হাত দিয়ে বাজাতে হয়, 'রাবণ হস্ত বীণা' – অর্থাৎ যা ছড় দিয়ে বাজানো হয়, 'শানাই' – অর্থাৎ যা মুখ দ্বারা বাজাতে হয় সবই তাত্ত্বিকভাবে বীণার দলভুক্ত। পরবর্তীকালে আলাদা গোত্র হিসেবে এদেরকে চিহ্নিত করতে প্রয়োজনে অন্য নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন শানাই বা এ ধরণের শুষির বাদ্যযন্ত্রকে বলা হয়েছে 'মুখ-বীণা'। [১৯]

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'ঃ

নাট্য-সংগীত বিষয়ে এটি প্রধাণতম প্রাচীন শাস্ত্র। এতে নাট্য-সংগীত সম্বন্ধে যেমন পূর্ণ আলোচনা আছে, তেমনি নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং ঐকতান সংগীতে উপাদান ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে বিচিত্র বিশ্লেষণ আছে। ৬০০০ শ্লোক নিয়ে ৩৬টি (মতান্তরে ৩৭টি) পরিচ্ছেদে এটি বিভক্ত। সংগীত বিষয়ে রচনা রয়েছে ২৮ থেকে ৩০ পরিচ্ছেদে। ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি প্রস্তুতিতে এই সংগীতালোচনা অতুলনীয়। [২০]

Dhaka University Institutional Repository

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে গান্ধর্ব সংগীত প্রসঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের বিষয় লিখিত হয়েছে একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে আরো বলা হয়েছে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ পদ গাইবার কথা। উল্লেখ করা হয়েছে যে, দু'প্রকার পদেই বেণু, বীণা, ঘন ও মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাদ্যের সহযোগ থাকে।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে 'চিত্রা' ও 'বিপঞ্চী' এই দু'টি বীণার উল্লেখ করেছেন। 'চিত্রাবীণা' সপ্ততন্ত্রীবিশিষ্ট এবং 'বিপঞ্চীবীণা' নয়টি তন্ত্রীযুক্ত। 'চিত্রাবীণা' আঙুল দিয়ে বাজানোর নিয়ম এবং 'বিপঞ্চীবীণা' ত্রিভুজাকার কোণ বা Plectrum দিয়ে বাজানোর নিয়ম।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে তারযুক্ত যতগুলো যন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে সবগুলোই কোন না কোন শ্রেণীভুক্ত বীণা হিসেবে অভিহিত ছিলো। ইতিহাসে ৫৮ ধরণের বীণার উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও কালের বিবর্তনে এর সব কয়টি এখন বিদ্যমান নাই, অধিকাংশই লুপ্ত হয়েছে অথবা এদের রূপান্তর ঘটেছে। তবে সবচেয়ে আলোচিত হয়েছে যে কয়টি বীণা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, স্বরস্বতী বীণা, রুদ্র বীণা এবং বিচিত্র বীণা। আরো অনেক ধরণের বীণা পরবর্তীতে প্রচলিত হয়েছে, তবে সেগুলোর উৎপত্তি মূলত এই তিন ধরণের বীণা থেকে। [২১]

বীণা পরিবার থেকে উদ্ভূত পরবর্তীকালের বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে কিন্নরী বীণা এবং আলাপিনী বীণা উল্লেখযোগ্য। ৪০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই বাদ্যযন্ত্র দু'টির বিকাশ ঘটে। আলাপিনী বীণা প্রস্তুত করা হতো বড় আকারের একটি শুকনো লাউয়ের সাথে একটি ফাঁপা বাঁশের দণ্ড যুক্ত করে। বাঁশের একপ্রান্তে লাউটি লাগানো থাকতো। দণ্ডের গায়ে মাত্র তিনটি পর্দা লাগানো থাকতো। দণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মাত্র একটি তার লাগানো থাকতো। পরবর্তীকালে অবশ্য আরো একটি তার এতে যুক্ত হয়। শার্ঙ্গদেবের আমলে এই যন্ত্রটির কিছু উন্নতি হয় এবং এতে আরো দু'টি পর্দা যুক্ত হয়।

কিন্নরী বীণা প্রায় সমসাময়িক কালের। ধারণা করা হয় মাতঙ্গ মুনি এই বীণার স্রষ্টা। এই বীণায় সাতটি পর্দা থাকতো। যন্ত্রটি তিনটি ভিন্ন মাপে তৈরি হতো, সে অনুযায়ী গঠনেও কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সবচেয়ে ছোট আকারের কিন্নরী বীণাকে বলা হতো লঘু কিন্নরী বীণা। এতে দণ্ডের দু'পাশে দু'টি লাউ

সংযুক্ত থাকতো। মাঝারি আকারের অর্থাৎ মধ্যম কিন্নরী বীণাতে তিনটি লাউ সংযুক্ত থাকতো। বড় আকারের কিন্নরী বীণায় মোট চারটি লাউ সংযুক্ত থাকতো।[২২]

.. ..

১। Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments". 2001. Rupa & Co. New Delhi. পৃঃ ১।

২। চক্রবর্তী, ড.মৃদুলকান্তি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা আয়োজিত "সুরে ও ছন্দে বাংলাদেশ" শিরোনামে আলোচনানুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ।

৩। Palmer, King : "Music". David Mckay & Co.Inc. New York. Third impression 1981. পৃঃ ১।

৪। খান, মোবারক হোসেন ঃ "বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ" ঃ খান, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ঃ ৫০।

৫। গোস্বামী, উৎপলা ঃ " ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ইতিহাস" ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, দীপায়ন, কোলকাতা, পৃঃ ৪।

৬। প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী ঃ "ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস" (প্রথম ভাগ), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭ ইং, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কোলকাতা, পৃ ঃ ৭৯।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮০।

৮। গোস্বামী, উৎপলা ঃ " ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ইতিহাস" ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, দীপায়ন, কোলকাতা, পৃঃ ৫।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮২।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯২।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯৩।

১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

১৩। প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী ঃ "ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস" (প্রথম ভাগ), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭ ইং, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কোলকাতা, পৃ ঃ ২৪৩।

১৪। www.webonautics.com/mythology/narada3.html

১৫। প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী ঃ "ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস" (প্রথম ভাগ), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭ ইং,

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কোলকাতা, পৃ ঃ ২৮৭।

১৬। দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৯১, পৃ ঃ ৩।

১৭। Kasliwal. Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi. ২।

১৮। দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ১৯৯১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, পৃ ঃ ৩।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫।

২০। রায়, সুকুমার ঃ "ভারতীয় সংগীত ইতিহাস ও পদ্ধতি", ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃঃ ২৫।

২১। Roy. Ajoi Sinha : "Musings on Music", West Bengal State Music Academy, 1992, পৃঃ১২

২২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

২য় অধ্যায় – মধ্যযুগের বাদ্যযন্ত্র

১২০০ থেকে ১৩০০ সাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতক একটি বিশিষ্ট সাংগীতিক যুগ। এযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর্ম হচ্ছে শার্ঙ্গদেব রচিত "সংগীত-রত্নাকর"।

"সংগীত-রত্নাকর" ঃ

গান্ধর্ব ও প্রাচীন ধারার সংগীত পদ্ধতিকে শার্ঙ্গদেব পূর্ণভাবে তাত্ত্বিক রূপ দান করেন তাঁর গ্রন্থে। "সংগীত-রত্নাকর" সাতটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। অধ্যায়গুলো হলো ঃ স্বর, রাগ, প্রকীর্ণ, প্রবন্ধ, তাল, বাদ্য ও সম্বন্ধীয়।[১] প্রত্যক্ষ সংগীত অভিজ্ঞতা ও শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে রচিত এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। উল্লিখিত সাতটি অধ্যায়ে সংগীতের বিভিন্ন দিকের গতিপ্রকৃতি ও কলারূপই তিনি শুধু ধরিয়ে দেন নি, বরং উত্তরকালের জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি রেখে গেছেন।

শার্ঙ্গদেব তাঁর গ্রন্থে 'একতন্ত্রী বীণা'কে তাঁর আমলে প্রচলিত যাবতীয় বীণার মধ্যে প্রধাণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে দশ ধরণের বীণার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো হলো – একতন্ত্রী, নকুলা, ত্রিতন্ত্রীকা, চিত্রা, বিপঞ্চী, মত্তকোকিলা, আলাপিনী, কিন্নরী (লঘু, বৃহৎ, মধ্যম), পিনাকী এবং নিঃশংক।[২]

'সংগীতোপনিষৎসারোদ্ধার' ঃ

চতুর্দশ শতকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'সংগীতোপনিষৎসারোদ্ধার'। রচয়িতা গুজরাটের অধিবাসী সুধাকলসা। বইটি রাগের শ্রেণীবিণ্যাসে নতুন ধারণার সূত্রপাতের জন্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এছাড়া এতে তের ধরণের বীণার তালিকা পাওয়া যায়। তবে একটি বিষয় যা সংগীত গবেষকদের কাছে লক্ষণীয়, তা হলো সেতার নামক কোন যন্ত্রের কথা এ বইতে উল্লেখ নাই। 'সংগীতোপনিষৎসারোদ্ধার' গ্রন্থে উল্লিখিত বীণাগুলো হচ্ছে –

পিনাকী, কিন্নরী, আলম্বী, কচ্ছপী, বৃহতী, মহতী, কলাবতী, প্রভাবতী, ঘোষাবতী, বিপঞ্চী, কণ্ঠকুনিকা, বল্লকী এবং ব্রহ্মবীণা।[৩]

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক অথবা তৎপরবর্তী যুগের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'সংগীতমকরন্দ'। এটির রচয়িতার নামও নারদ (ইনি আদি নারদ নন)। এই গ্রন্থে প্রায় ঊনিশটি বীণার নাম উল্লেখ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, কচ্ছপী, কুব্জিক, চিত্রা, বহন্তী, পরিবাদিনী, জয়া, ঘোষাবতী, জ্যেষ্ঠা, নকুলী, মহতী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, কুর্মী, রাবণী, সারস্বতী, কিন্নরী, সৌরন্ধ্রী, ঘোষকা। [৪]

"তারিখ-ই-ফিরুজশাহী" ঃ

'সংগীতমকরন্দ'-এর পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জিয়াউদ্দিন বারানি রচিত "তারিখ-ই-ফিরুজশাহী" গ্রন্থটি। ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে বইটি রচনা সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় কিভাবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ভারতবর্ষে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে এবং পরে এইসব যন্ত্রের ভারতীয়করণ ঘটে। তাঁর গ্রন্থে যেসব বাদ্যযন্ত্রের নাম বলা হয়েছে তার মধ্যে রবাবের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি থেকে জানা যায় যে, সুলতান কায়কোবাদের রাজত্বকালে (১২৮৮-১২৯৫) গজল গানের সংগে রবাব যন্ত্রের সঙ্গত চলত। [৫]

আমীর খসরু এবং তাঁর গ্রন্থে উল্লেখিত সংগীত বিষয়ক প্রামাণ্য বিবরণঃ

মধ্যযুগের সংগীতের ইতিহাসে কিংবদন্তীর মত একটি নাম হচ্ছে হজরত (সম্মানসূচক উপাধি) আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫)। তুরস্ক থেকে ভারতে আগমনকারী একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা আমীর সাইফউদ্দিন মাহমুদ জাতিতে তুর্কী ছিলেন। [৬] সুলতান ইলতুত্‌মিশের আমলে তিনি মধ্য এশিয়ার বল্‌খ থেকে ভারতের উত্তর প্রদেশের পাতিয়ালি রাজ্যে আসেন এবং তাঁর রাজসভায় সভাসদ হিসেবে যোগ দেন। পাতিয়ালি রাজ্যে তিনি স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন এবং সেখানে তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের যুদ্ধমন্ত্রী ইমাদুল মুল্‌ক-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। আমীর সাইফুদ্দিন মাহমুদ দম্পতির তিন পুত্রের মধ্যে আমীর খসরু ছিলেন কনিষ্ঠ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আমীর খসরু। একাধিক ভাষায় রচিত তাঁর গীতি এবং কাব্যসমূহ সংখ্যা এবং উৎকর্ষের দিক থেকে অনন্য। তাঁর সংগীত জীবন নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিক বাদ্যযন্ত্রের নাম এসেছে। এর মধ্যে কিছু কিছু বর্ণনা ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর সম্পৃক্ততা নাই এমন কোন কোন বিষয়েও তাঁর নাম যুক্ত হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা প্রাসঙ্গিক কারণে উল্লিখিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত জীবনে আমীর খসরুর প্রতিভার সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর হচ্ছে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো। তবে শুধু কবি নন, তিনি ছিলেন আলাউদ্দিন খিলজী এবং আরো একাধিক রাজপুরুষের সভাসদ তথা সামরিক অফিসার। এতদ্সত্ত্বেও সংগীতবিদ্যায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং ভারতীয় এবং পারস্য সংগীতরীতির মিশ্রণে বারো স্বর বিশিষ্ট সংগীতপদ্ধতির আবিষ্কার তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। ভারতীয় এবং পারস্য রাগের মিশ্রণে তিনি একাধিক রাগের সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া একাধিক বাদ্যযন্ত্রে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সাহিত্যকর্মে যেমন বিপুল নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন, সংগীত বিষয়েও তেমনি অনেক লিখিত নিদর্শন তিনি রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু সম্ভবত রাজকার্যে এবং কাব্যসৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে এই বিষয়ে তিনি বেশি সময় ব্যয় করেন নি। সংগীত বিষয়ে তাঁর সৃষ্ট কর্মের অধিকাংশ নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর রচিত 'ইজাজ-ই-খসরুভী' গ্রন্থে। বইটিতে সংগীত গবেষকদের গবেষণাকর্মের প্রচুর উপাদান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রচুর গবেষণাকর্মও সাধিত হয়েছে। স্বীয় সৃষ্ট সংগীতকর্মের সবটুকু বর্ণনা এই বইতে পাওয়া যায়। বর্তমান গবেষণা কর্মের জন্য এর বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক বর্ণনাগুলো সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আমীর খসরু উল্লেখ করেছেন যে, কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত উভয় বিষয়ে তাঁর খুব ভাল দক্ষতা ছিলো। বিশেষ করে 'চাঙ' নামক একটি বাদ্যযন্ত্রের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তিনি এই যন্ত্রে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। চাঙ ছাড়াও আরো কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যেমন, নাওয়ালিক এবং দাফ। শুধু বাদন নয়, এই যন্ত্রগুলোর নানা প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি হলে তা সারিয়ে তোলার কৌশলে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এছাড়া রুবাব এবং বারবাত যন্ত্রে তিনি নতুন ধরণের বাদনশৈলী উদ্ভাবন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। আমীর খসরুর রচনায় আরো যেসব বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে – তাম্বুর, রুদ, নাঈ, আলাওয়ান, কিংরা, সাহনাই, মিসকাত, খিসতিত, সুফরি, আজব রুদ, উদ, বৈত্র হিন্দী ইত্যাদি। [৭]

গ্রন্থে এই সকল বাদ্যযন্ত্রের কাব্যসুষমামন্ডিত বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। সংগীত সম্পর্কিত তাঁর সকল কৃতকর্মের বিবরণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর গ্রন্থে। তবে একটি কথা উল্লেখযোগ্য, কোথাও সেতার নামক কোন যন্ত্রের নাম তিনি উল্লেখ করেন বি। যদিও লোক পরম্পরায় সেতার আবিস্কারের সাথে আমীর খসরুর নাম জড়িত বলে লোক সমাজে একটা ধারণা প্রচলিত হয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সেতার যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৩৯ সালে লিখিত 'মুরাক্কা-ই-দিল্লী' নামক গ্রন্থে। এর আগে কোন বইয়ে সেতারের উল্লেখ পাওয়া যায় নি। গবেষণা করে জানা গেছে বইটি যখন লেখা হয়েছে তার কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ মোগল আমলের শেষভাগে এই যন্ত্রের প্রচলন শুরু হয়। উল্লেখ্য আমীর খসরুর জন্ম ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে। সেতার আবিস্কারের প্রায় চারশ' বছর পূর্বে আমীর খসরুর মৃত্যু হয়। [৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লীতে খসরু খান বলে এক সংগীতজ্ঞর নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, সেতার তৈরিতে যাঁর অবদান রয়েছে বলে উর্দু, হিন্দী এবং ইংরেজি ভাষায় লিখিত সংগীত গবেষকদের গবেষণা থেকে জানা যায়। ইনি ছিলেন মিঞা তানসেনের জামাতা নৌবাৎ খাঁর ১৫ তম প্রজন্মের উত্তরসূরী। [৯] তবে কততম প্রজন্মের উত্তরসূরী এ বিষয়ে মতভেদ আছে। 'সংগীত সুদর্শন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর আমীর খসরু সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। গ্রন্থে লেখক সুদর্শন শাস্ত্রী এই আমীর খসরুকে 'ফকির' বলে উল্লেখ করেছেন। লেখকের মতে খসরুর ছেলের নাম ফিরোজ খান এবং ফিরোজ খানের ছেলে মসিদ খান। এই মসিদ খান ছিলেন এক অসাধারণ সেতারবাদক এবং তিনিই 'মসিদখানি গত' নামে সেতারে বাজাবার উপযোগী বিলম্বিত গত প্রথম সৃষ্টি করেন। প্রায় একই ধরণের তথ্য পাওয়া যায় এল.ডি.যোশীর লেখা থেকেও।[১০] খসরুর বড় ভাই ছিলেন সে সময়কার সংগীতের এক দিকপাল নিয়ামত খান। ফকির খসরু যাঁকে বলা হয়েছে তাঁর আসল নাম সম্ভবত খসরু খান। কিন্তু কিংবদন্তীতুল্য কবি এবং সংগীতজ্ঞ হজরত আমীর খসরুর সাথে নামে মিল থাকায় এবং প্রথমোক্ত জনের প্রবল খ্যাতির প্রভাবে পরবর্তীতে তাঁর নাম আমীর খসরু হিসেবে প্রচলিত হয়ে যায়। [১১]

বিশিষ্ট গবেষক ড. ওয়াহিদ মির্জা, যিনি আমীর খসরুর জীবন ও কর্মের ওপর সুদীর্ঘ গবেষণা করেছেন এবং অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন, তাঁর ভাষ্যে, "সেতারের অবিস্কার খসরুর অবদান বলে একটি ধারণা সাধারণভাবে সকলের মধ্যে গৃহীত হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে খসরুর লেখার কোন স্থানে 'সেতার' নামের কোন চিহ্ন খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছি, যদিও তাঁর সময়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের পৃষ্ঠাভর্তি বিবরণ রয়েছে গ্রন্থে।" [১২]

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা বোঝা যায় যে, এ সময়ের মধ্যে পারস্য এবং তার আশেপাশের দেশসমূহ থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ভারতবর্ষে এসে সেখানকার সংগীতাঙ্গনে নিজস্ব স্থান দখল করে নেয়। শুধু তাই নয়, পূর্ব থেকে প্রচলিত বিভিন্ন বীনা গোত্রীয় যন্ত্রসমূহ, যেমন, চিত্রা বীণা, কচ্ছপী বীণা ইত্যাদি যন্ত্রের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার ফলে পরবর্তী যুগে বিবর্তনের ফলস্বরূপ বিভিন্ন নতুন ধরণের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলণ ঘটতে থাকে এ দেশে।

"আইন-ই-আকবরী" ঃ

আমীর খসরু এবং তাঁর সমসাময়িক সংগীতজ্ঞদের পরবর্তী যুগের উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় আবুল ফজল রচিত "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে। "আইন-ই-আকবরী"র সংগীত অধ্যায় পরিসরে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সংকলনটি মূল্যবান। আবুল ফজলের অসামান্য সম্পাদন কৌশলে উত্তর ভারতীয় সংগীতের তথ্যগুলো উপযুক্ত বিণ্যাসে রক্ষিত হয়েছে।

আবুল ফজল এই অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন "সংগীত"। সংগীত শব্দের সংজ্ঞা নিরূপন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন -- সংগীত হচ্ছে বিভিন্ন নাগমা (গীত), সাজ (বাদ্য) ও রক্স্ (নৃত্য) এবং এতদ্ব্যতীত অপরাপর বিষয় সম্পর্কিত বিদ্যা। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই উদ্দেশ্যে সাতটি অধ্যায় পরিকল্পিত হয়েছে। অধ্যায়গুলো হচ্ছে -- স্বর অধ্যায় (অর্থাৎ আওয়াজ সম্পর্কিত তথ্য), রাগবিবেক অধ্যায়, প্রকীর্ণ অধ্যায় (অর্থাৎ আলাপ-এর রীতিনীতি সম্পর্কিত, নামটি সংগীত রত্নাকর থেকে গৃহীত), প্রবন্ধ অধ্যায়, তাল অধ্যায়, বাদ্য অধ্যায় এবং নৃত্য অধ্যায়।

বাদ্য অধ্যায়ে বাদ্যযন্ত্রের প্রকারভেদ ও তৎসম্পর্কীয় আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। টীকাকার রাজ্যেশ্বর মিত্রের ভাবানুবাদ থেকে নিচের বিবরণ দেওয়া হলো --

বাদ্যযন্ত্র চার প্রকার, তত -- যেগুলো তারে বাজানো হয়; বিতত -- যেগুলো চর্মে আঘাত করে বাজানো হয়; ঘন -- দু'টি কঠিন বস্তু যাদের সংঘাতে আওয়াজ উৎপন্ন হয়; শুষির -- যেগুলো ফুৎকারযোগে বাজানো হয়। এই প্রত্যেকটির অনেকগুলো প্রকারভেদ আছে। আবুল ফজল এর কয়েকটি উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পর্যায়ের বাদ্য ঃ

যন্তর –

কাঠের তৈরি দেহ। লম্বায় এক গজ। ভিতরটা ফাঁপা। দু'দিকে দু'টি লাউ যুক্ত থাকে এবং উপরের দিয়ে পাঁচটি লোহার তার দু'দিক থেকে শক্তভাবে বাঁধা থাকে।

যন্তর বা যন্ত্র শব্দটি দ্বারা একসময় ত্রিতন্ত্রী বীণা বোঝাতো। সংগীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন, "ত্রিতন্ত্রীকৈব লোকে যন্ত্রশব্দেনোচ্যতে"।

বীণ –

যন্তরের মত, কিন্তু এতে তারের সংখ্যা তিনটি।

কিন্নর –

বীণের মত, কিন্তু এতে পর্দা বা সারিকা থাকে না।

অমৃতি (অম্বরতী) –

এর দণ্ডটি সুরবীণের দণ্ড অপেক্ষা ছোট। একটি ছোট লাউ উপরের দিকে একটু নিম্নভাগে সংলগ্ন থাকে। একটি লোহার তারে অপরিবর্তিতভাবে সব কয়টি পর্দা বাজানো যায়।

রবাব –

এতে ছয়টি তাঁতের তার থাকে। কোন কোন যন্ত্রে বারোটি এবং কোনটিতে আঠারোটি তারও থাকে।

স্বরমণ্ডল –

কানুন-এর মত যন্ত্র। এতে একুশটি তার থাকে। অনেকে লোহার তার ব্যবহার করেন, কেউ কেউ তামার তার, কোন সম্প্রদায় তাঁতের তার ব্যবহার করেন।

এটি পাশ্চাত্য ডালসিমার (Dulcimer) অথবা স্যালটারি (Psaltery) এর অনুরূপ। আমাদের দেশেও প্রাচীন কাল থেকে এই বাদ্যযন্ত্রটির প্রচলন রয়েছে। সংস্কৃতশাস্ত্রে এর অপর নাম মত্তকোকিলা।

সারেঙ্গি –

আকৃতিতে রবাবের চেয়ে ছোট। ঘীচবের মত বাজানো হয়।

ঘীচক বাদ্যযন্ত্রটিও আকবরের সময় ভারত উপমহাদেশে দেখা যেত। এই বাদ্যযন্ত্রটি পারস্য দেশে বিশেষ প্রচলিত ছিলো। এটি ইউরোপীয় Viol জাতীয় যন্ত্র, ছড় দিয়ে বাজানো হত।

Dhaka University Institutional Repository

পিনাক –

একে সুরবিতানও বলা হতো। কাঠের তৈরি। আয়তনে ধনুকের মত কিছুটা বাঁকানো। ধনুকের ছিলার মত প্রাণীর অন্ত্র থেকে নির্মিত একটি পাকানো তার এর ওপর বাঁধা থাকে। কাঠের তৈরি পেয়ালার মত একটি পাত্র এই বাদ্যের দু'দিকে উল্টোভাবে বসানো থাকে। এই যন্ত্রটিও ঘীচকের মত বাজানো হয়।

সংগীতরত্নাকরেও পিনাক বীণার অনুরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে।

অধিটি –

এতে একটি লাউ এবং দু'টি তার থাকে।

কিঙ্গিরা –

বীণের মত, কিন্তু প্রাণীর অন্ত্র থেকে নির্মিত দু'টি তন্ত্রী এবং ছোট ছোট কয়েকটি লাউ থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বাদ্য ঃ

পাখোয়াজ –

মোটা কাঠ থেকে হরিতকীর মত আকৃতিতে তৈরি হয়। এর মাঝখানটা ফাঁপা থাকে। লম্বায় এক গজের কিছু বেশি। এর মাথা দু'টি কলসীর মুখের চেয়ে কিছু চওড়া হয়। এদের চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। এর চারিদিকে নাকাড়ার মত চামড়ার পাত টানা থাকে। চারটি কাঠের টুকরা একহাতের কিছু কম দূরে বাঁ দিকে পাখোয়াজের বৃত্তে লাগানো থাকে। এই কাঠের টুকরাগুলোকে মুচড়ে সুর নামানো চড়ানো হয়।

আওয়াজ –

একটি ফাঁপা কাঠ থেকে তৈরি হয়। দু'টি ছোট চর্মবাদ্যের মুখ একত্র করলে যে রকম হয় সে রকম।

দুহুল –

এটি বিশেষ পরিচিত। আমরা একেই ঢোল বলি।

ঢাহা –

এটি দুহুল বা ঢোলের মত, কিন্তু খুব ছোট।

অর্ধাওয়াজ –

আকৃতিতে আওয়াজ নামক যন্ত্রের অর্ধেক।

দফ্ –

Dhaka University Institutional Repository

এটি বিশেষ পরিচিত। একটি গোল ফ্রেমের একদিকে চামড়া ছাওয়া থাকে। বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে বাজানো হয়।

খঞ্জর –

এটিকে ছোট দফ্ বলা যায়। ভিতরে ঘন্টি থাকে। এর মুখ কলসীর মত চওড়া।

তৃতীয় পর্যায়ের বাদ্য ঃ

তাল –

মুখ দু'টি সমান করে গঠন করা হয়, বিস্তৃত ওষ্ঠযুক্ত পেয়ালার মত। অর্থাৎ এর কানাটি চওড়া হবে। আমাদের বর্তমান করতাল।

কাঠতাল –

আকৃতিতে ছোট মাছের মত। কাঠের বা পাথরের তৈরি।

চতুর্থ পর্যায়ের বাদ্য ঃ

শাহ্না –

ফারসিতে এটি সুর্ণা নামে পরিচিত। এটি আমাদের দেশে বর্তমানে শানাই নামে পরিচিত।

মশ্ক্ –

এতে দুটি ছোট বাঁশি থাকে এবং তাতে মাপ অনুসারে কয়েকটি ছিদ্র থাকে। এই বাঁশি দু'টি মশ্ক্ অর্থাৎ চামড়ার থলিতে মিলিত হয়। ফারসি ভাষায় একে নাই-ই-অম্বন (বাঁশরীযুক্ত থলি) বলে। এটি ব্যাগ পাইপের অনুরূপ।

মরিলী –

'নাই'-এর অনুরূপ। 'নাই' শব্দের অর্থ হচ্ছে বাঁশি।

উপাঙ্গ –

এক প্রকার 'নাই' বা বাঁশি। এর ভিতরটা ফাঁপা, লম্বায় প্রায় এক গজ। এর উপরের দিকে মধ্যস্থলে একটি ফুটো থাকে। এই ফুটোর ভিতরে একটি সরু বাঁশি বসানো থাকে। [১৩]

Dhaka University Institutional Repository

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ থেকে জানা যায় আকবরের সভায় ছত্রিশ জন প্রধাণ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এঁরা হলেন ঃ তানসেন, বাবা রামদাস, সুবহান খাঁ, শ্রীজ্ঞান খাঁ, মিঞা চাঁদ, বিচিত্র খাঁ, মহম্মদ খাঁ ঢাঢ়ী, বীরমন্ডল খাঁ, বাজবাহাদুর, শিহাব খাঁ, দাউদ ঢাঢ়ী, সরোদ খাঁ, মিঞা লাল, তান তরঙ্গ খাঁ, মোল্লা ইশাক ঢাঢ়ী, উস্তা দোস্ত, চরজু, পূরবীন খাঁ, সুরদাস, চাঁদ খাঁ, রঙ্গ সেন, শেখ দেওয়ান ঢাঢ়ী, রহমতুল্লাহ, মীর সায়্যিদ আলী, উস্তা ইউসুফ, কাসীম, তাশ বেগ, সুলতান হাফিজ হোসেন, বহরম কুলি, সুলতান হাসিম, মোশাদ, উস্তা শাহ মহম্মদ, উস্তা আমিন, হাফিজ খাজা আলী, মীর আবদুল্লাহ, উস্তা মহম্মদ হোসেন। [১৪]

এই ছত্রিশ জন সংগীতজ্ঞের মধ্যে বীরমন্ডল খাঁ, শিহাব খাঁ, উস্তা দোস্ত, মোশাদ, পূরবীন খাঁ, শেখ দেওয়ান ঢাঢ়ী, মীর সায়্যিদ আলী, উস্তা ইউসুফ, কাসীম, তাশ বেগ, বহরাম কুলি, সুলতান হাসিম, উস্তা শাহ মহম্মদ, উস্তা আমিন, মীর আবদুল্লাহ, উস্তা মহম্মদ হোসেন – এরা ছিলেন বাদ্যযন্ত্রী। এদের মধ্যে বীরমণ্ডল খাঁ ছিলেন সুরমণ্ডলবাদক, শাহাব খাঁ ও পূরবীণ খাঁ ছিলেন বীণাবাদক, উস্তা দোস্ত ছিলেন নাই বা বংশীবাদক, মীর সজ্জীদ আলী ও বাহরাম কুলি ছিলেন ঘীচক বাদক, কাশিম ওরফে কোহবার বাজতেন কাবুস ও রবাবের মত স্ব-উদ্ভাবিত একটি যন্ত্র, উস্তা ইউসুফ, উস্তা মোহাম্মদ আমিন, সুলতান হাশিম ও উস্তা মোহাম্মদ হোসেন ছিলেন তম্বুর বাদক, তাশবেগ ছিলেন কাবুস বাদক, উস্তা শাহ মোহাম্মদ ছিলেন সুরনাই বাদক, শেখ দেওয়ান ঢাঢ়ী ও মীর আব্দুল্লাহ ছিলেন কানুন বাদক। [১৫]

তবে সকল শিল্পীদের সেরা শিল্পী ছিলেন মিঞা তানসেন। তাঁর একক প্রতিভা সে যুগের কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতকে উৎকর্ষের দিক থেকে অনেক অগ্রসর করে দিয়েছিলো। কাজেই প্রাসঙ্গিক কারণে মিঞা তানসেনের জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

মিঞা তানসেন, তাঁর সংগীত জীবন এবং তাঁর বীণকার বংশের অবদান

সম্রাট আকবরের আকবরের রাজসভার সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা ছিলেন খ্যাতিমান সংগীতজ্ঞ মিঞা তানসেন। কণ্ঠ এবং যন্ত্রসংগীতে অসামান্য অবদান তাঁর জীবনকে কিংবদন্তীর ওপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

তানসেনের জন্মকাল সম্বন্ধে বহু রকমের ধারণা প্রচলিত আছে, যেমন -- ১৪৯৩, ১৫০১, ১৫০৫-৬, ১৫১৬, ১৫২০ ১৫৩১ ইত্যাদি। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন। এর সাত বছর

Dhaka University Institutional Repository

পরে তানসেন আকবরের দরবারে স্থান লাভ করেন। ড.বিমল রায়ের মতে ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ। এ প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, তানসেন যখন আকবরের দরবারে আগমন করেন তখন তাঁর পুত্রেরাও সংগীতজ্ঞ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তানসেন যখন আকবরের দরবারে যোগদান করেন তখন তিনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন না। কারণ তাঁর সংগীত প্রতিভা যদি একেবারেই নষ্ট হয়ে যেত তাহলে আকবরের দরবারে এসে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। আকবরের রাজত্ব শুরু হয় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে এবং তানসেন আকবরের দরবারে আসেন ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে। এ অবস্থায় তানসেনের জন্ম ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে হওয়ার সম্ভাবনা। [১৬]

তানসেনের উদ্ভাবনী শক্তি এবং মৌলিকতা ছিলো অসাধারণ। তিনি প্রথমে ধ্রুপদ ও পরে প্রবন্ধ রীতিতে দক্ষতা অর্জন করেন। বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিলো। বর্তমান পদ্ধতির আলাপ-স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ গান, স্বরের বৈচিত্র, কানাড়া-মল্লার-সারং-টোড়ী প্রভৃতি নতুন রাগ সৃষ্টি, দীপক রাগের নতুন রূপদান ইত্যাদি তাঁর চমৎকারিত্ব সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে। 'আইন-ই-আকবরী' রচয়িতা আবুল ফজল বলেছেন, "তানসেনের মত গায়ক ভারতবর্ষে গত এক হাজার বছরে কেউ জন্মায় নি।" তিনি আকবরের দরবারে সকল সংগীতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

আকবরের রাজসভায় আসার আগে তানসেন রেওয়ার অন্তর্গত বন্ধগড়ের রাজা রামচাঁদ বাঘেলার রাজসভায় ছিলেন। তাঁর দিল্লী আগমন সম্পর্কে আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী'তে বলা হয়েছে – "সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের ৭ম বর্ষে তানসেনের খ্যাতির কথা তিনি শুনতে পেলেন। তিনি আগ্রায় তানসেনকে নিয়ে আসবার জন্য একজন বাহককে (বাহকের নাম জালালউদ্দিন কুরচি) পাঠিয়ে দিলেন। আকবরের অনুরোধ উপেক্ষা করার ক্ষমতা রামচাঁদের ছিলো না। তিনি বাদ্যযন্ত্র এবং অনেক উপহারসহ তানসেনকে আগ্রায় পাঠালেন। তানসেন প্রথম রাজসভায় গান গেয়ে দুই লক্ষ টাকা ইনাম পেলেন। তিনি আকবরের সভায় থেকে গেলেন।" [১৭]

তানসেন বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামী এবং গোয়ালিয়রের শেখ মোহাম্মদ গাউস – এই দু'জনের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। ফলে প্রথমোক্তজনের কাছ থেকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত এবং শেষোক্তজনের কাছ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পারস্য সংগীতের উত্তরাধিকার লাভ করেন। তাই তাঁর সৃষ্ট রাগগুলো ভারতীয় ও পারস্য সংগীতের ঢঙে মিশ্রিত। [১৮]

তানসেন একাধারে গায়ক, গীতিকবি, গায়নরীতির মৌলিক ধারার আবিষ্কারক, নতুন রাগ-রাগিনীর আবিষ্কারক, সংগীত শাস্ত্রকার এবং বাদ্যযন্ত্রবিশারদ ছিলেন। কিন্তু তাঁর গায়ক পরিচয়ের আড়ালে অন্য পরিচয়সমূহ ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। অথচ যন্ত্রসংগীতে তাঁর অবদান কম নয়। তাঁকে রবার যন্ত্রের উদ্ভাবক বলা হয়। উদ্ভাবক এই অর্থে, সম্ভবত তিনি এই যন্ত্রটিকে নতুনভাবে ব্যবহার করার প্রথা শুরু করেছিলেন। রুদ্রবীণা নামে যে যন্ত্রটি তৎতালে প্রচলিত ছিলো এর বাঁ হাতে বাজানোর অংশটি (ফিংগার বোর্ড) বড় হওয়ার কারণে বাজাতে অসুবিধা হতো। এই অসুবিধা দূর করার জন্য তানসেন একে নবরূপ দান করেন। [১৯]

আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে কাসেম কোহবার নামক এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে রবাবের আবিষ্কর্তা হিসেবে। তবে সে যন্ত্রটির আকার অপরিশীলিত ছিলো। [২০] ধারণা করা হয় তানসেন এ যন্ত্রের আকারকে পরিশীলিত করেন এবং এই যন্ত্রে ভারতীয় সুরবৈচিত্রকে ফুটিয়ে তোলেন। তার ফলে রবাব অন্যতম প্রধাণ সংগীতযন্ত্র হিসেবে পরিচিত হয়। হার্বার্ট এ. পপলি বলেছেন

"The Great Tansen played this instrument. It is a handsome instrument and has a very pleasing tone, somewhat fuller than that of the Sarangi." [২১]

তানসেন রবাব যন্ত্রটিকে ধ্রুপদ অঙ্গের আলাপ বাজানোর উপযোগী করে তৈরি করেন।

তানসেন একজন উচ্চমানের বীণাবাদক ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে এই বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার বিকাশ ঘটান। তাঁর কন্যা স্বরস্বতী সম্পর্কে নানা রকম কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সমসাময়িক বীণকার মিশ্রি সিং (পরবর্তীকালে নৌবাৎ খাঁ) এর সঙ্গে স্বরস্বতীর বিবাহ হয়। মিশ্রি সিং বীণে তানসেনের সহকারী সংগীতকার, দক্ষতায় অতুলনীয় বাদক ছিলেন। [২২]

Dhaka University Institutional Repository

নৌবাৎ খাঁর বংশধরেরা বংশপরম্পরায় বীণাবাদনে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। সেজন্য তানসেনের কন্যা বংশীয় শিল্পীরা যেমন বীণকার বংশ হিসেবে পরিচিত তেমনি তানসেনের সঙ্গে সম্পর্ক হেতু এই বংশ সেনী নামে পরিচিত এবং এই বংশের প্রচলিত ঘরানা সেনী ঘরানা হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

তানসেনের পূর্বযুগের ধ্রুপদ রচয়িতাগন শব্দ ও ছন্দের ওপরে বিশেষ জোর দিতেন। তানসেন সুরের দিকে এবং সুরের মাধুর্যের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গোয়ালিয়রের সাধনার ফলস্বরূপ তাঁর ধ্রুপদে কথার বাহুল্যের পরিবর্তে তানের বাহুল্য এবং মীড়ের কাজের প্রয়োগ বেশি হয়েছে। তাঁর আলাপ পরিবেশনায় গভীরতা এবং আলঙ্কারিক প্রয়োগ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই বিষয়টি পরবর্তীকালে তাঁর কণ্যাবংশীয় সেনী ঘরানার বীণকারদের বাদনে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মিঞা তানসেন এবং তাঁর বংশধরদের হাতে 'আলাপ' পরিপক্কতা লাভ করে, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অবয়ব এবং কাঠামো লাভ করে। এ সময় থেকেই আলাপের পরিপূর্ন রূপ অর্থাৎ 'দ্বাদশাঙ্গের আলাপ' প্রচলিত হয়।

তানসেনের পুত্রকন্যাদের বিবরণ ঃ

তানসেনের কন্যা স্বরস্বতী ও জামাতা নৌবাৎ খাঁর বংশে বীণা বাদনের ঐতিহ্য বংশপরম্পরায় প্রচলিত হয়ে যায়। অপরদিকে পুত্র বিলাস খাঁর বংশে রবাব যন্ত্রটি একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিলো। এ প্রসঙ্গে হার্বার্ট এ. পপলির মন্তব্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়।

"The disciples of Tansen divided themselves into two groups, the Rababias and the Binkars. The former used the new instrument invented by Tansen, the Rabab; while the later used the Bin, as the Vina is called in the North." [২৩]

নৌবাৎ খা একজন উঁচুদরের বীণকার ছিলেন। তাঁর আমলেই কিন্নরী বীণার সর্বাধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্বরস্বতী বীণার বিবর্তনে নৌবাৎ খাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আকারের পূর্ণতা, স্বরের ব্যাপ্তি এবং অন্যান্য গুণাবলির বিকাশ সাধনের ফলে অন্যান্য বীণার চেয়ে এই স্বরস্বতী বীণা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। মীড়, গমক, ঘসিট, সুত এবং অন্যান্য আলঙ্কারিক পরিবেশনায় এটি একটি অনন্য বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের এই পর্যায়ে ধ্রুপদ সংগীত শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করে এবং বীণা যন্ত্রটি এই ধারার সংগীত পরিবেশনের এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। তানসেনের বংশধরেরা কণ্ঠ এবং বাদ্য, উভয় সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। শুধু পারদর্শী নন, তাঁরা অত্যন্ত প্রতিভাধর এবং নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী ছিলেন। তানসেনের পুত্র বংশে সর্বশেষ উত্তরাধিকারী ছিলেন সংগীতনায়ক ওস্তাদ বড়ে মুহাম্মাদ আলী খাঁ এবং তাঁর ছোট ভাই ওস্তাদ মুহাম্মাদ আলী খাঁ। তাঁরা ধ্রুপদিয়া এবং রবাবিয়া ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর এই বংশের সমাপ্তি ঘটে। তানসেনের কন্যা বংশে সর্বশেষ উত্তরাধিকারদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সংগীতনায়ক ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ। তিনি ছিলেন ধ্রুপদিয়া এবং বীণকার। তাঁর পুত্র ওস্তাদ দবির খাঁ। এঁরাই ছিলেন কন্যা বংশের শেষ শিল্পী। [২৪]

তবে ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। ফলে সুরের পরম্পরা এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গবেষণার ধারাবাহিকতা চলমান থাকে এবং ভিন্ন পরিবেশে তা বিকাশ লাভ করে অবশেষে বিশ্বব্যাপি এদেশীয় বাদ্যযন্ত্রের পরিচিতি আনয়ন করে।

.. ..

১. রায়, সুকুমার ঃ "ভারতীয় সংগীত ইতিহাস ও পদ্ধতি", ১৯৮৮ ইং, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, পৃ ঃ ৩৫।

২. Miner. Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃঃ ২৩৩।

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩।

৪. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী ঃ "ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস" (প্রথম ভাগ), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭ ইং, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কোলকাতা, পৃ ঃ ২৮৮।

৫. গোস্বামী, উৎপলা ঃ " ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ইতিহাস" ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, দীপায়ন, কোলকাতা, পৃঃ ৮২।

৬. Mirza, Dr.Wahid :The Life and Works of Amir Khusrau, Idarah-I Adabiyat-I Delli, India. 2nd edition. 1974. পৃ ঃ ৮ এবং Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries". First Indian Edition. Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited. Delhi, India, পৃ ঃ ১৯।

৭. Rehman, Sabahuddin Abdur : Amir Khusrau as a Genius, Idarah-I Adabiyat-I Delli,

Dhaka University Institutional Repository

India. 1982.

৮. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ১৮-১৯।

৯. http://yellowbellmusic.com/instruments/string/history_sitar.php

১০. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ২২।

১১. Kasliwal. Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi. পৃঃ ১৪৩।

১২. Mirza, Dr.Wahid :The Life and Works of Amir Khusrau, Idarah-I Adabiyat-I Delli, India, 2nd edition. 1974. পৃঃ ২৩৯।

১৩. মিত্র, রাজ্যেশ্বর ঃ "মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা", পরিবর্ধিত প্রকাশ, ১৯৮৫, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, পৃঃ ২২।

১৪. রায়, সুকুমার ঃ "ভারতীয় সংগীত ইতিহাস ও পদ্ধতি", ১৯৮৮ ইং, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, পৃ ঃ ৬৮।

১৫. খান, মোবারক হোসেন ঃ "বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ" ঃ খান, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ঃ ৫২।

১৬. গোস্বামী, উৎপলা ঃ " ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ইতিহাস" ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, দীপায়ন, কোলকাতা, পৃঃ ৯১৮।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১২১।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১২৮।

১৯. Roy, Ajoi Sinha : "Musings on Music", West Bengal State Music Academy, 1992, পৃঃ ৩৮।

২০. প্রাগুক্ত, 1992, পৃঃ ৩৯।

২১. Herbert A. Popley : "The Music of India" Calcutta, 1950, page 115

২২. রায়, সুকুমার ঃ "ভারতীয় সংগীত ইতিহাস ও পদ্ধতি", ১৯৮৮ ইং, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, পৃ ঃ ৬৭।

২৩. Herbert A. Popley : "The Music of India" Calcutta, 1950, page 17-18.

Dhaka University Institutional Repository

২৪. Roy, Ajoi Sinha : "Musings on Music", West Bengal State Music Academy, 1992, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায় – আধুনিক যুগের বাদ্যযন্ত্র

১৭৫৭ খিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগ বলে বিবেচনা করে থাকেন। সে অনুযায়ী এর পরবর্তী সময়কে নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আধুনিক যুগে বাদ্যযন্ত্রের দ্রুত বিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা হতে থাকে। ফলস্বরূপ বিবর্তনের ধারায় চলমান বাদ্যযন্ত্রগুলো পূর্ণতাপ্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হয় এবং আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যে ধারার সংগীতের প্রচলন চলে এসেছে তাকে বলা হয় ধ্রুপদ সংগীত। ধ্রুপদ সংগীতকে শাস্ত্রীয় সংগীতের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলা হয়ে থাকে। ধ্রুপদ তখন প্রধাণ সভা সংগীত। সে সময়ে কণ্ঠসংগীতে যেমন ধ্রুপদ পরিবেশন করতেন শ্রেষ্ঠ কলাবন্তগন, তেমনি বাদ্যযন্ত্রেও ধ্রুপদী সংগীত পরিবেশন করতেন রাজসভার উঁচুমানের বাদকগন। সেনী ঘরানার শিল্পীরা কণ্ঠসংগীতের পাশাপাশি রবাব ও বীনে (রুদ্র বীণা) ধ্রুপদী সংগীত পরিবেশন করে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

ধ্রুপদ সংগীতে দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারটি বিভাগে মীড়, গমক ইত্যাদির সাহায্যে বিলম্বিত থেকে ক্রমান্বয়ে দ্রুততর লয়ে আলাপ পর্ব সমাপ্ত করা হয়।

ক্রমে সংগীত রীতির বিবর্তনের ফলে ধ্রুপদের স্থানে খেয়াল আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। ফার্সি ভাষায় 'খেয়াল' আলাপের পরে মূল গানে প্রবেশ করা হয়। অর্থাৎ বাণী উচ্চারণ করে গান গাওয়া হয়। গানের চারটি বিভাগ (স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ) স্থির লয়ে গাইবার পর দুগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, ছয়গুণ, আটগুণ ইত্যাদি লয়ে গানটি গাওয়া হয় এবং প্রয়োজনবোধে ঐ লয়েই গমক, তেহাই ইত্যাদি প্রয়োগ করে গান শেষ করা হয়। ধ্রুপদে সাধারণত পাখোয়াজ সঙ্গত করা হয়, কারণ পাখোয়াজের শব্দ ধ্রুপদের ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মানানসই।

খেয়াল শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কল্পনা। নানাবিধ তান বিস্তার ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্ন তালে রাগ গায়নকে বলা হয় খেয়াল।[১] খেয়াল পরিবেশনার ক্ষেত্রে একজন শিল্পীর যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে এবং এখানে

Dhaka University Institutional Repository

ইমপ্রোভাইজেশনের অনুমতি আছে বা সুযোগ রয়েছে। খেয়ালকে শোভিত করার জন্য অলংকরণ, স্বরের কম্পন, মীড়, গমক এবং নানা ধরণের তান – এ সবকিছুই ব্যবহার করা যেতে পারে।

খেয়াল রাগের উপর ভিত্তি করে রচনা করা হয় এবং একমাত্র রাগ ছাড়া তেমন কোন অনমনীয় বিধিনিষেধ এতে আরোপিত হয় না। খেয়ালের অলংকরণের রীতি এবং ইমপ্রোভাইজেশনের প্রথা ধ্রুপদে অনুপস্থিত। ধ্রুপদ এবং খেয়ালের তুলনামূলক আলোচনা এবং খেয়ালের বিকাশ প্রসঙ্গে সংগীত গবেষক ম.ন.মুস্তাফার "আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে" গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো।

"তদানীন্তন ভারতীয় সংগীত ধর্মীয় আচার আচরণের নাগপাশে কঠোরভাবে আবদ্ধ। .. .. সংগীত তাদের কাছে জীবনের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতকে অনুধাবন ও আবিস্কারের প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলো। গান গাইতে গেলেই মনে করা হতো এটি একটি ধর্মীয় আচার হিসেবে পালিত হতে যাচ্ছে এবং এর জন্য নির্ধারিত নিয়ম-কানুন অলঙ্ঘনীয়ভাবে মানতে হবে। এই সময়ে ধর্ম প্রভাবমুক্ত, পরিমার্জিত সংগীতের নব তরঙ্গ নতুন এক আবেদন নিয়ে ভারতীয় সংগীত অঙ্গনে প্রবেশ করলো। বলতে গেলে 'খেয়াল'ই সর্বপ্রথম ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি।"

সংগীতের নতুন পদ্ধতি বলতে খেয়ালের কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংগীত গুণী হজরত আমীর খসরুর অবদানের কথা উল্লেখযোগ্য। খেয়াল রচনার ভিত্তি তৈরিতে হজরত আমীর খসরুর অবদান রয়েছে। আমীর খসরু খেয়ালের আবিস্কর্তা না হলেও অলকৃত সুরের কাজ প্রয়োগ করে গান গাওয়ার একটি ধারার সূচনা তাঁর হাতেই হয়েছিলো। প্রসঙ্গক্রমে পুনরায় "আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে" গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো।

"তিনি (আমীর খসরু) অলংকৃত সুরের কাজে মুসলিম পদ্ধতিতে গান গাওয়ার যে প্রণালী উদ্ভাবন করেছিলেন মধ্যযুগীয় অনেক ইতিহাসবেত্তা সেজন্য তাঁকে খেয়ালের প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। তিনি দেখিয়েছেন কি করে গানের সুর দ্রুত অনুবর্তনে একের পর আরেকটি এসে পড়ে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে বাতাসের গায়ে কি এক মোহনীয় সুর ঝংকার সৃষ্টি করে। তিনি সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই মুক্ত রীতির প্রচলন ঘটিয়েছেন। সুরের কাজে তিনি যে আবেশ অনুভূতি সৃষ্টির

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়াস পেয়েছিলেন – খেয়ালের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু তাই। এই মুক্ত পদ্ধতিই খেয়াল পদ্ধতির ভিত রচনা করেছে।

প্রায় দু'শো বছর পর জৌনপুরের শরকী শাসকরা উদারভাবে মুসলিম পদ্ধতির সংগীত পদ্ধতিকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। আমীর খসরুর মৃত্যুর পর থেকে সুলতান হোসের শাহ্ শরকীর রাজ্যভার গ্রহন করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ধ্রুপদের একচ্ছত্র আধিপত্যের দরুন মুসলিম রীতির সংগীতের মোটেও কোন উৎকর্ষ ঘটেনি। তবে মুসলিম শাসকবর্গের দরবারে মুসলিম সংগীত রীতিসমূহ আপন অস্তিত্ব নিয়ে টিকে ছিলো। সুলতান হোসেন শাহ্ শরকী তাঁর ব্যক্তিগত অংশ গ্রহন ও সাধনায় খেয়ালকে জীবনী শক্তিতে উজ্জীবিত করেন। .. .. একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে হোসেন শাহ্ শরকীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমীর খসরুর ভাবধারার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে খেয়ালের রূপরেখা প্রণয়ন করেন এবং খেয়াল পদ্ধতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

খেয়ালকে এরপর সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা, জনপ্রিয়তার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সভা-সংগীতজ্ঞ নিয়ামত খাঁ সদারঙ্গ। নিবেদিতপ্রাণ একজন সাধক সংগীতজ্ঞ হয়ে নতুন রীতির প্রচলন ও সংযোজন ঘটিয়ে তিনি খেয়ালকে নবতর রূপ দান করেন। তাঁরই সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রক্ষণশীল ধ্রুপদকে পশ্চাতে ফেলে খেয়াল জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে কালজয়ী হয়ে আছে।" [২]

সংগীতের এই বিশেষ ধারার প্রবর্তনের সাথে বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তনের একটি যোগসূত্র রয়েছে। কারণ ধ্রুপদ থেকে খেয়ালের এই পালাবদলের সাথে বীণা, রবাব ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের স্থলে সারেঙ্গী এবং সেতারের এবং আরো পরে সরোদের উত্থান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সারেঙ্গী প্রচলনের পটভূমি ঃ

উচ্চাঙ্গ সংগীতে সারেঙ্গীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে সপ্তদশ অথবা অষ্টদশ শতাব্দীতে। যদিও এর অনেক আগে সারেঙ্গীর উদ্ভব হয়েছে। প্রথম যুগে লোকজ এবং ধর্মীয় সংগীতে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিলো। এর পরে বাঈজীদের নৃত্য এবং ঠুমরী স্টাইলের গানের সহযোগী হিসেবে সারেঙ্গী প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। লোকজ সংগীত, ধর্মীয় সংগীত এবং নৃত্যের সহযোগী থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতে

Dhaka University Institutional Repository

সারেঙ্গীর আগমন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সংগীতের ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তনের সাথে বিষয়টি জড়িত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে ধ্রুপদের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে এবং খেয়ালের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধ্রুপদ সংগীতের সাথে সহযোগী হিসেবে বীণা বাজানো হতো। কিন্তু খেয়ালের সঙ্গে বীণা তেমন মানানসই না হওয়ার কারণে নতুন একটি বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সারেঙ্গী যখন নৃত্যের সহযোগী হিসেবে ব্যবহৃত হতো তখনই এই যন্ত্রের অমিত সম্ভাবনার বিষয়টি সংগীতজ্ঞদের নজরে আসে। কণ্ঠে যে সকল কাজ পরিবেশন করা হয় তার সবই সারেঙ্গীতে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এ কারণে এটি উচ্চাঙ্গ সংগীতের তথা খেয়ালের উৎকৃষ্ট সহযোগী হওয়ার দাবীদার। ঠিক এ কারণেই ক্রমে উচ্চাঙ্গ সংগীতে সারেঙ্গীর নির্দিষ্ট একটি অবস্থান তৈরি হয়ে যায় এবং প্রায় দু'শ বছর একচেটিয়াভাবে এই অবস্থান অক্ষুন্ন থাকে। তবে একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো, অনুগামী যন্ত্র ছাড়া একক উচ্চাঙ্গ যন্ত্র হিসেবে সারেঙ্গী তখনো সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিলো না। সারেঙ্গীকে উৎকৃষ্ট মানের উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশনের যন্ত্র হিসেবে প্রথমে য়াঁর অবদানের কথা স্বীকার করতে হয় তিনি পানিপট-সোনিপট ঘরানার প্রখ্যাত বাদক হায়দর বখ্স। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁর জন্ম। তিনি সারেঙ্গীতে এমন কতগুলো বাজ প্রবর্তন করেন যার ফলে সারেঙ্গী উঁচু মানের একটি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

এর পরবর্তী সময়ে যাঁর অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন বুন্দু খাঁ। দিল্লী ঘরানার এই শিল্পীর জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। তিনিও এর বাজ পরিশীলিত করার বিষয়ে গবেষনা করেন। তাঁর পরবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য বাদক হচ্ছেন রাম নারায়ন, যিনি বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একক বাদনের যন্ত্র হিসেবে সারেঙ্গীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম দিকে তাঁকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, কিন্তু সব বাধার মুখে তিনি সহযোগী হিসেবে সারেঙ্গী না বাজিয়ে একক যন্ত্র হিসেবে সারেঙ্গী বাজানোর সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। ফলে উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে একক যন্ত্র হিসেবে সারেঙ্গী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে আরো অনেক বাদক তাঁর পথ অনুসরণ করে একক সারেঙ্গী বাদক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, মম্মন খাঁ, আবদুল আজিজ খাঁ, আশিক হোসেন, আবদুল মজিদ খাঁ, বড়ে সাবির খাঁ, আহমেদী খাঁ, গোপাল মিশ্র এবং সাম্প্রতিক সময়ে হনুমান প্রসাদ মিশ্র, সুলতান খাঁ, রমেশ মিশ্র প্রমূখ।

Dhaka University Institutional Repository

সারেঙ্গীর পরে একই গোত্রের অর্থাৎ ছড় দিয়ে বাজানোর আরেকটি যন্ত্র অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। যন্ত্রটি হচ্ছে এস্রাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই যন্ত্রের আবির্ভাব।[৩] সারেঙ্গীর মতই এই যন্ত্র ছড় দিয়ে বাজাতে হয়। বাঁ হাতের আঙুলের সাহায্যে তারে ঘর্ষন করে সুর উৎপন্ন করতে হয়, যদিও আঙুলের ব্যবহারে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তবে সারেঙ্গীর সাথে এস্রাজের মূল পার্থক্য হলো এই যে, এস্রাজের উপরের অংশ অনেকটা সেতারের মত এবং তাতে পর্দা বাঁধা রয়েছে। সারেঙ্গীতে কোন পর্দা নাই। এস্রাজের শব্দ মানুষের কণ্ঠের খুব কাছাকাছি। সেজন্য কণ্ঠসংগীতের সহযোগী হিসেবে এটি স্বল্প সময়ে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরে একক বাদনের যন্ত্র হিসেবেও এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এস্রাজ যন্ত্রের একজন প্রখ্যাত বাদক ছিলেন বাংলাদেশের ভ্রাহ্মনবাড়িয়া জেলায় জন্ম গ্রহনকারী ওস্তাদ ফুলঝুরি খাঁ। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রনে বিশ্বভারতীর যন্ত্র সংগীত বিভাগের প্রধাণ হিসেবে বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সেতারের প্রচলন ঃ

উজবেকিস্তানের "দুতার" যন্ত্রে অতিরিক্ত আরেকটি তার সংযোজন করে এর নাম হয়েছিলো "সেহ্তার" (সেহ্ অর্থ তিন)।[৪] পারস্য থেকে এই যন্ত্রের আগমন ঘটে উপমহাদেশের মাটিতে। পরবর্তীকালে এ দেশে প্রচলিত একাধিক প্রকারের বীণার সাথে মিলমিশ হওয়ার পর বিবর্তন ঘটে যেভাবে আধুনিক সেতারের উদ্ভব হয় তার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে সেতারের প্রচলন প্রসঙ্গে শুধু একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান যুগের সেতারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সকল কারুকাজ ও কৌশল যেভাবে পরিবেশন করা যায় প্রাথমিক যুগের সেতারে তা সম্ভব ছিলো না। একক বাদনের উপযোগী হয়ে ওঠার পূর্বে নৃত্যের সহযোগী হিসেবে এই যন্ত্রটির বহুল প্রচলন ছিলো। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে একজন ইউরোপীয় শিল্পীর অঙ্কিত, বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত একটি চিত্রকর্মে বাঈজী নৃত্যের একটি দৃশ্যে সহযোগী যন্ত্র হিসেবে স্পষ্টত একটি ছোট আকারের সেতার দেখা যায়।[৫] সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -১ ঃ ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত চিত্রে নাচের সহযোগী যন্ত্র সেতার

তবে এই সময়ের মধ্যে দিল্লীর রাজ দরবারে একক বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সেতার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন তথ্যও ইতিহাসে পাওয়া যায়। [৬] দিল্লীর সেতার ছিলো তুলনামূলক ভাবে উন্নত মানের এবং গৎ, তোড়া ও আলাপ বাজানোর উপযোগী।

দিল্লীতে সেতারকে প্রচলিত করার পেছনে এবং সেতারের বিবর্তনে নিয়ামত খাঁ (সদারঙ্গ) এবং তাঁর বংশের অন্যান্য শিল্পীদের বিশেষ অবদান রয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে আনুমানিক ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে নিয়ামত খাঁর জন্ম।[৭] তানসেন কন্যা স্বরস্বতী এবং জামাতা নৌবাত খাঁর বংশে নৌবাত খাঁর জন্ম। নিয়ামত খাঁ নিজে অবশ্য বীণ বাদক ছিলেন। তিনি ধ্রুপদও গাইতেন। এছাড়া খেয়াল রচনায় তাঁর অবদান রয়েছে। যন্ত্র সংগীতেও তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি সেতারে তিন তারের পরিবর্তে সাতটি তার সংযোজন করেন। চিকারীর তার সংযোজন তাঁরই অবদান।[৮] সেতার উদ্ভাবনে তাঁর ভাই আমীর খাঁ অথবা আমীর খসরুর অবদান রয়েছে। ভ্রাতস্পুত্র ফিরোজ খান (অদারঙ্গ) শুধু অসাধারণ সেতারবাদক ছিলেন না, তাঁর হাতে ফিরোজখানি বাজ বিকাশ লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীতে ফিরোজ খানের পুত্র বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ মসিদ খাঁ বীণার বাজের অনুকরণে মীড় এবং ঝালা বাজানোর কৌশল প্রবর্তন করেন। ধ্রুপদ সংগীতের প্রভাবে তিনি সেতারে বাজানোর বিলম্বিত গৎ সৃষ্টি করেন যা মসিদখানি গৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রথমদিকে নৃত্যের সহযোগী হিসেবে সেতারের প্রচলন থাকলেও ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সেতার একক উচ্চাঙ্গ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। [৯]

সেতার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারের যন্ত্র হিসেবে রুদ্র বীণা সবচেয়ে সমাদৃত ছিলো। বীণায় পরিবেশিত হতো ধ্রুপদী সংগীত। কিন্তু সেতারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের যে ধারা পরিবেশনের প্রচলন হলো তা প্রকৃতপক্ষে খেয়ালের অনুরূপ। তবে সেতার এমন ধরনের একটি আধুনিক যন্ত্র যাতে ধ্রুপদ এবং খেয়াল থেকে শুরু করে লঘু উচ্চাঙ্গ, এমনকি লঘু সংগীত পর্যন্ত সব ধরনের সংগীত পরিবেশন করা যায়। আধুনিক যুগে তাই সেতার সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সেতার বাদনে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম হলো – নিয়ামত খাঁ, ফিরোজ খাঁ, মসিদ খাঁ এবং সাম্প্রতিক সময়ে পণ্ডিত রবি শঙ্কর, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ (প্রয়াত), ওস্তাদ ইমরাত খাঁ, ওস্তাদ শাহেদ পারভেজ, ওস্তাদ খাদেম হোসেন খান (প্রয়াত), ওস্তাদ আবেদ হোসেন খান (প্রয়াত), ওস্তাদ মীর কাসেম খান (প্রয়াত), ওস্তাদ খুরশিদ খান প্রমূখ।

সরোদের প্রচলন ঃ

পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই উপমহাদেশে রবাবের প্রচলন চলে আসছে। তবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে এটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। রুদ্র বীণা এবং রবাব – এ দু'টি ছিলো সে সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। ধ্রুপদী সংগীত পরিবেশনে এ দু'টি যন্ত্র ছিলো অনন্য। মিঞা তানসেনের পুত্র এবং কন্যার বংশধরগন এই দু'টি যন্ত্রে বংশ পরম্পরায় ধ্রুপদী সংগীতের চর্চা করে এক অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সুরসৃঙ্গার এবং সুরবাহার যন্ত্র দু'টির আবির্ভাবে রবাব এবং রুদ্র বীণার চর্চায় কিছুটা ভাটা পড়ে। আরো পরে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রথমে সেতার এবং পরে সরোদের আগমনের পর পূর্বের প্রায় সব যন্ত্রই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। রুদ্র বীণার স্থান দখল করে নেয় সেতার এবং রবাবের স্থান দখল করে নেয় সরোদ।

Dhaka University Institutional Repository

তানসেনের বংশধরেরা ধ্রুপদী বা হিন্দুস্তানী রবাবের চর্চা করতেন। সম্রাট আকবরের দরবারে মিঞা তানসেন ছাড়াও একজন বিখ্যাত রবাব বাদক ছিলেন, যাঁর নাম কাসিম কোহবার। সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ্ রঙ্গিলের আমলে কয়েকজন বিখ্যাত রবাব বাদক খ্যাতির শিখরে আরোহন করেছিলেন। তাঁরা হলেন, হাসান খাঁ, ছজ্জু খাঁ এবং তাঁর তিন পুত্র প্যার খাঁ, বাসত খাঁ ও জাফর খাঁ। শেষোক্ত তিনজন ছিলেন মোগল দরবারে সর্বশেষ সেনিয়া ঘরানার শিল্পী। তবে তানসেনের আরো পরবর্তী প্রজন্মের বংশধরদের মধ্যে অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ, যিনি রামপুরের মহারাজার সভা সংগীতজ্ঞ ছিলেন। সেনিয়া শিল্পীরা নিজ বংশের বাইরে কাউকে রবাব শিক্ষা দিতেন না। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন একটি যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ সময়ে ক্রমে আফগানী রবাবের আগমনে এবং প্রভাবে সরোদ যন্ত্রের সৃষ্টি হয় যা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। রবাব থেকে সরোদের এই পালাবদল ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সে সময়কার তিনজন বিখ্যাত সরোদ বাদক ছিলেন নিয়ামতউল্লাহ খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ এবং আবিদ আলী খাঁ। সরোদ আবিস্কারে তিনজনই কৃতিত্ব দাবী করে থাকেন। তবে যাঁর হাতেই সরোদ সর্বপ্রথম রূপ লাভ করুক না কেন, এর সর্বশেষ পরিমার্জনা এবং আধুনিক রূপায়ন ঘটে বাংলাদেশের দু'জন শ্রেষ্ঠ সংগীত গুণী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর হাতে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর উদ্ভাবিত আধুনিক সরোদকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করে তোলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ এই যন্ত্রটিকে বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করেন। ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আরেকজন উঁচুদরের সরোদশিল্পী। অপরদিকে হাফিজ আলী খাঁর পরিবারেও বংশ পরম্পরায় সরোদের চর্চা অব্যাহত রয়েছে। হাফিজ আলী খাঁর পুত্র ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ ভারতের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন সরোদ বাদক।

.. ..

১. ঘোষ, শম্ভু নাথ ঃ "সংগীতের ইতিবৃত্ত", প্রথম খণ্ড, গান্ধার প্রকাশনী, কলিকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৭৯, পৃ ঃ ১২৬।

২. মুস্তাফা, ম.ন. ঃ "আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে", ১৯৮১ ইং, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ ঃ ১৮৪-১৮৫।

৩. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi। পৃঃ ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৪. www.afganland.com

৫. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৩৫ ।

৬. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৩৭ ।

৭. ঘোষ, শম্ভু নাথ ঃ "সংগীতের ইতিবৃত্ত", দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯, গাঙ্কার প্রকাশনী, কলিকাতা, ।

৮. গোস্বামী, উৎপলা ঃ " ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ইতিহাস" ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, দীপায়ন, কোলকাতা, পৃঃ ১৬২ ।

৯. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৪১ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায় – বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ ঃ

(ক) নির্মাণ উপকরণ, এর সহজলভ্যতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদান

বাংলাদেশে বর্তমানে যে বাদ্যযন্ত্রগুলো প্রচলিত রয়েছে সেগুলো বেশিরভাগই অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আঞ্চলিক বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কিছু লোক বাদ্যযন্ত্র এদেশে রয়েছে যেগুলো শুধু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই প্রচলিত। এগুলো ছাড়া সামগ্রিকভাবে বিশেষত উচ্চাঙ্গ সংগীতের পরিবেশনে যে যন্ত্রগুলো প্রচলিত রয়েছে সেগুলো উপমহাদেশের ব্যাপক এলাকায় প্রায় অভিন্ন। যেমন, সেতার, সরোদ, সুরবাহার, এস্রাজ, দিলরুবা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। বর্তমান আলোচনা মূলত এইসব বাদ্যযন্ত্রকে নিয়ে ব্যপ্ত থাকবে।

এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের গঠনগত এবং ধ্বণিগত কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা। বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এ ধরণের ভিন্নতা এবং বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টা সহজবোধ্য হবে।

প্রথমে আসা যাক নির্মাণ উপকরণ প্রসঙ্গে। আমাদের দেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রগুলো কি দিয়ে তৈরি? সেতার, সুরবাহার, তানপুরা, সরোদ ইত্যাদি যন্ত্র তৈরি হয় মূলত কাঠ দিয়ে এবং এবং এদের বেশিরভাগের শব্দ প্রকোষ্ঠ বা সাউন্ড চেম্বার তৈরি হয় লাউ দিয়ে। কাঠের মধ্যে সেগুন এবং মেহগনি বেশি জনপ্রিয়। সেতার, সরোদ ইত্যাদিতে এই সব কাঠ ব্যবহৃত হয়। দোতারা, তবলা ইত্যাদিতে নিম কাঠ এবং আম কাঠও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া লোকজ বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে বাঁশ এবং নারকেলের মালা ব্যবহৃত হয়। উপাদানগুলো একান্তই দেশীয় এবং সহজলভ্য। ঐতিহাসিক অথবা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একই ধরণের নির্মাণ উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয় একটি ভৌগোলিক এলাকায় কোন ধরণের উপকরণ সেখানকার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখবে। অর্থাৎ পরিবেশের উপর নির্ভর করে একটি অঞ্চলের সংস্কৃতির অনেক বিষয় গড়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

মরু অঞ্চলে যেমন প্রচুর খেজুর গাছ জন্মায়, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যেমন ডুমুর, আঙুর, কমলালেবু ইত্যাদি রসালো ফলের প্রচুর ফলন হয়, বনে জন্মায় সিডার, পাইন ইত্যাদি গাছ, তেমনি বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত বলে এদেশে আম, নিম প্রভৃতি গাছ প্রচুর জন্মায়। তরিতরকারীর মধ্যে লাউ উল্লেখযোগ্য। বনাঞ্চলে জন্মায় সেগুন এবং মেহগনি কাঠ। এছাড়া বাঁশ এবং নারকেলও সহজলভ্য। এগুলোই আমাদের বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের মূল উপকরণ। বিশেষ করে এদেশীয় বাদ্যযন্ত্রে শব্দ প্রকোষ্ঠ হিসেবে লাউয়ের ব্যবহার বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দ প্রকোষ্ঠ হিসেবে লাউয়ের ব্যবহার কোন ইউরোপীয বাদ্যযন্ত্রে কখনো দেখা যায় না। এই শব্দ প্রকোষ্ঠ নির্মাণের বিষয়টি পাশ্চাত্যের যে কোন দেশ থেকে একেবারে আলাদা। [১]

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো – পাশ্চাত্যের বাদ্যযন্ত্রগুলো যে কাঠ দিয়ে তৈরি তা সাধারণত নরম প্রকৃতির কাঠ। গিটার, বেহালা, চেলো ইত্যাদি বহুল প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রগুলো (শুধু পিয়ানো এবং হার্প ব্যতীত) পাইন, সিডার ইত্যাদি গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। আমাদের দেশের বাদ্যযন্ত্রগুলো সাধারণত সেগুন, মেহগনি, নিম ইত্যাদি কাঠ দিয়ে তৈরি, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বেশ শক্ত প্রকৃতির কাঠ। তবলা তৈরি করতে হলে, অথবা সরোদের খোল তৈরি করতে হলে বড় কাষ্ঠখন্ড খুদে ভেতরটা ফাঁপা করে নিয়ে এগুলো তৈরি করতে হয়। শুধু সরোদ বা বীণা কেন, বীনা গোত্রীয় যতগুলো যন্ত্র রয়েছে, যেমন সেতার, সুরবাহার, তানপুরা, এস্রাজ, সারেঙ্গী, সুর-শৃঙ্গার ইত্যাদি সকল যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ শক্ত বড় কাঠের টুকরা থেকে প্রয়োজনীয় আকারের ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করে, অত্যন্ত যত্নের সাথে নির্দিষ্ট আকৃতিতে নিয়ে এসে এবং সবশেষে মসৃণ করে এগুলোর কাঠামো তৈরি করা হয়। ফলস্বরূপ মোলায়েম ধরণের শব্দ সৃষ্টি হয় যা বিভিন্ন ধরণের মীড়, গমক, ঘসিট, আশ, সুত, জমজমা ইত্যাদি বাজানোর জন্য খুব উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এখানে পুনরায় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এদেশীয় কোন যন্ত্র থেকেই খুব তীক্ষ্ণ ধরণের শব্দ উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের বাদ্যযন্ত্রগুলোর শব্দ তুলনামূলকভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। এটিকেও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বলে ধরে নিতে হবে। কেননা যুগের পর যুগ ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে এই সকল শব্দের শব্দের ধরণ পরিমার্জিত করা হয়। চূড়ান্তভাবে আমাদের বাদ্যযন্ত্রে আমরা যে আওয়াজ পেয়েছি (Final product) তা যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে গড়ে ওঠা আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয় একটি পাশ্চাত্য

Dhaka University Institutional Repository

বাদ্যযন্ত্রের এদেশের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাথে মিল রেখে অভিযোজন, তথা পরিমার্জন এবং কিছুটা রূপান্তরের উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে। আলোচ্য বাদ্যযন্ত্রটি হচ্ছে পাশ্চাত্যের জনপ্রিয় হাওয়াইন গিটার। আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীতের যে বৈশিষ্ট্য – গভীরতা এবং পূর্ণতা, হাওয়াইয়ান গিটারের অতি তীক্ষ্ণ শব্দের সাহায্যে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিলো না। [২] অথচ উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের কাছে এর জনপ্রিয়তা কিংবা গ্রহণ করার ইচ্ছা ক্রমশ বেড়ে চলছিলো। কাজেই শিল্পীরা এর তীক্ষ্ণতা হ্রাস করার গবেষণায় ব্রতী হলেন। ক্রমে এর শব্দ প্রকোষ্ঠ বড় আকারের করা হলো, তুলনামূলক মোটা তার ব্যবহারের প্রচলন এলো, এমনকি তারের সংখ্যায় পরিবর্তন এনে এবং তরফের তার সংযোজন করে এটি উপমহাদেশীয় উত্তরভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত বাদনের উপযুক্ত করে তোলা হলো। সাম্প্রতিকতম সময়ে এর নামেও পরিবর্তন এসেছে এবং যন্ত্রটি এখন মোহনবীণা নামে বেশি পরিচিত। এর অপর নাম ইন্ডিয়ান স্লাইড গিটার।

(খ) বাদ্যযন্ত্রের আকৃতিগত পার্থক্য (শ্রেণীবিভাগ)

গঠন ও আকার ভেদে বাদ্যযন্ত্রের রকমভেদ রয়েছে। আর এই রকমভেদের মধ্যেই তাদের সৃষ্টির রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে।

কোন কোন দেশে গঠন উপাদানের উপর ভিত্তি করে বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যেমন চীনদেশে বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হলো বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের উপাদান। সে দেশে চার ধরণের উপাদানের উপর ভিত্তি করে বাদ্যযন্ত্রের চারটি শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

১। 'কিন' (ধাতু)

২। 'চে' (পাথর)

৩। 'তু' (পাথর) এবং

৪। 'চু' (বাঁশ)

বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে সকল দেশে গৃহীত যে শ্রেণীবিণ্যাস সেটি আবার অন্য রকম। এখানেও বাদ্যযন্ত্রসমূহকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন,

১। 'অটোফোন্‌স' (পরবর্তী নাম ইডিওফোন্‌স) -

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ যা একবার তৈরি করার পর আর সুর বাঁধার দরকার হয় না। যেমন, নানা ধরণের ঘন্টা – বেল, রড ইত্যাদি।

২। 'মেমব্রানোফোন্স' (এটি 'ড্রাম্স' গোত্র) -

অর্থাৎ যে সকল যন্ত্র পিটিয়ে বা তালি দিয়ে বাজাতে হয়।

৩। কর্ডোফোন্স -

অর্তাৎ তারের যন্ত্র। তারের সাহায্যে নানা ধরণের সুর উৎপন্ন করা হয়।

৪। 'এয়ারোফোন্স' -

অর্থাৎ যে সকল যন্ত্র ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়।

এই শ্রেণীবিভাগ করেছেন উনিশ শতকের পাশ্চাত্য পণ্ডিত মাইয়ো।[৩] অথচ বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত শ্রেণীবিভাগটি আমাদের দেশে করা হয়েছিলো প্রায় দুই হাজার বছর আগে। প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। নাট্যশাস্ত্রের ২৮ পরিচ্ছেদে 'লক্ষণান্বিতম্ আতোদ্য' (বা পূত সংগীতযন্ত্র) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভরত বাদ্যযন্ত্রকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন, ১। তত যন্ত্র (তার যন্ত্র), ২। আনদ্ধ বা অনবদ্ধ যন্ত্র, ৩। ঘন যন্ত্র এবং ৪। শুষির যন্ত্র।[৪]

তত যন্ত্র (তার যন্ত্র) ঃ

যে সকল বাদ্যযন্ত্র বাজাতে তত বা তারের দরকার হয় সেগুলোকে তত যন্ত্র বলে। তত যন্ত্র দু'প্রকারের ঃ অংগুলিত্র তত যন্ত্র এবং ধনুস্তত বা ধনুর্যন্ত্র। যে সকল যন্ত্র মিজরাব ও জওয়া দিয়ে বাজাতে হয় সেগুলোকে অংগুলিত্র তত যন্ত্র বলে। যে সকল যন্ত্র ছড় দিয়ে বাজানো হয় সেগুলোকে ধনুস্তত বা ধনুর্যন্ত্র বলে। সেতার, সরোদ, সুরবাহার ইত্যাদি প্রথম প্রকার ততযন্ত্র। এস্রাজ, বেহালা, দিলরুবা ইদ্যাদি দ্বিতীয় প্রকার ততযন্ত্র।

আনদ্ধ যন্ত্র ঃ

যে সকল যন্ত্র চামড়ার আচ্ছাদন বা ছাউনি দিয়ে তৈরি সেগুলোকে আনদ্ধ যন্ত্র বলা হয়। এই যন্ত্রের ছাউনির উপর হাত দিয়ে অথবা কাঠি দিয়ে শব্দ উৎপন্ন করা হয়। যেমন, তবলা-বাঁয়া, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, পাখোয়াজ, মাদল ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

ঘন যন্ত্র ঃ

যে সকল যন্ত্র কাঁসা, পিতল, লোহা প্রভৃতি দিয়ে তৈরি সেগুলোকে ঘন যন্ত্র বলা হয়। এগুলো নিরেট ধাতুর তৈরি এবং এগুলোর সুর বাঁধার প্রয়োজন হয় না।

শুষির যন্ত্র ঃ

যে সকল যন্ত্র ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় সেগুলোকে শুষির যন্ত্র বলা হয়। যেমন, বাঁশি, সানাই, শাঁখ ইত্যাদি। এগুলো অবশ্যই ফাঁপা ধরণের যার মধ্য দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। ফুৎকার এবং আঙুলের সাহায্যে বায়ুস্তম্ভ নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন সুর উৎপন্ন করা হয়।

লক্ষ্য করলে দেখ যাবে প্রাচীনকালে প্রদত্ত ভরতের শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক যা আধুনিক শ্রেণীবিভাগের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভরতের শ্রেণীবিভাগ এবং মাইয়ো প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগের সামঞ্জস্য নিম্নরূপে দেখানো যায় –

ঘন যন্ত্র ---- ইডিওফোন্‌স

আনদ্ধ যন্ত্র ---- মেমব্রানোফোন্‌স

শুষির যন্ত্র ---- এয়ারোফোন্‌স

তত যন্ত্র ---- কর্ডোফোন্‌স

আধুনিক আলোচনায় আটোফোন এবং মেমব্রানোফোনকে অনেক সময় একত্রিত করে একে বলা হয় 'পারকাশন্‌স' এবং সেই সাথে নতুন আরেকটি শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেটি হচ্ছে ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র।[৫] সেইক্ষেত্রে শ্রেণী হলো মোট চারটিই। আর যদি পূর্বোক্ত চারটি শ্রেণী বজায় রেখে তার সাথে ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র যোগ করা হয় তাহলে শ্রেণী হবে মোট পাঁচটি।

এই শ্রেণীবিভাগ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এবং প্রচলিত হলেও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র রয়েছে যেগুলোকে উল্লিখিত কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তরা যায় না। এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে 'তরঙ্গ' গোত্রভুক্ত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, যেমন, জল তরঙ্গ, কাষ্ঠ তরঙ্গ, নল তরঙ্গ, তবলা তরঙ্গ, মৃদঙ্গ তরঙ্গ ইত্যাদি। ড. লাল মণি মিশ্রর মতে এই সকল বাদ্যযন্ত্রকে 'তরঙ্গ যন্ত্র' নাম দিয়ে পৃথক একটি শ্রেণীভুক্ত করা দরকার।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২ ঃ জল তরঙ্গ

চিত্র-৩ ঃ নল তরঙ্গ

আধুনিক যুগে বিভিন্ন তারের যন্ত্রে আওয়াজ জোরালো করার জন্য বিদ্যুতের সাহায্য নেওয়া হয়। এসব যন্ত্রে শব্দ প্রকোষ্ঠের দরকার হয় না। বৈদ্যুতিক এমপ্লিফায়ার এর সাহায্যে আওয়াজ বর্ধিত করা হয়। যেমন ইলেকট্রিক গিটার। এছাড়া বৈদ্যুতিক কি-বোর্ড জাতীয় যে সকল বাদ্যযন্ত্র রয়েছে সেগুলোর আওয়াজ বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রেও একই ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক সুবিধার সাহায্য ব্যতীত প্রচলিত এবং ঐতিহ্যবাহী অনেক বাদ্যযন্ত্র আধুনিক যুগেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, সেতার, সরোদ, বেহালা ইত্যাদি। এসব যন্ত্র থেকে যে আওয়াজ উৎপন্ন হয় বৈদ্যুতিক সিনথেসাইজারের সাহায্যে তার বিকল্প উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। কারণ শুধু নির্দিষ্ট আওয়াজ এই সকল যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। এর বাদন পদ্ধতিতে যে সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন, মীড়, গমক, রেশ হ্রস্ব অথবা দীর্ঘায়িত করা ইত্যাদি কৌশল, এসব বিষয় মানুষের হাতের স্পর্শ ব্যতীত আনয়ন করা সম্ভব নয়। এই ধরণের সকল যন্ত্র দলগতভাবে একোয়াস্টিক (Acoustic) যন্ত্র নামে পরিচিত। সেই অর্থে বর্তমানে প্রচলিত সকল বাদ্যযন্ত্র একোয়াস্টিক এবং ইলেকট্রিক এ দু'টি দলভুক্ত।

বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বিভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে এবং এদের অঙ্গগুলো বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই এগুলোর বিভিন্ন অংশগুলো স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা দরকার। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের অঙ্গগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ হয়ে থাকে ঃ –

১। তুম্বা, খোল –

কোন কোন যন্ত্রের খোলস (যেমন, সরোদ, এস্রাজ, কয়েক প্রকার বীণা ইত্যাদি) আস্ত কাঠ কুঁদে তৈরি হয়। এতে নানা রকমের বিশেষ কাঠ ব্যবহৃত হয়। এগুলো কেটে প্রয়োজনীয় আকারে আনা হয়। সেতার

Dhaka University Institutional Repository

ও বীণার তুলনায় সরোদ, এস্রাজ এই যন্ত্রগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট – কোলে রেখে বাজানো হয়, খোলের গোড়ার দিকটা নৌকার মত হয়।

সেতারে খোল জাতীয় অংশ শুকনো লাউ দিয়ে তৈরি হয়। একে তুম্বা বলে। সুদৃশ্য সুডৌল লাউয়ের খোল বীণা, তানপুরা, সেতার, সুরবাহার ইত্যাদি যন্ত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। কোন কোন যন্ত্রে দু'টো তুম্বা ব্যবহৃত হয়। উপরের দিকের তুম্বা আকারে ছোট হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে লাগানোর ব্যবস্থা থাকে। অর্থাৎ স্ক্রুর সাহায্যে লাগানো যায়, প্রয়োজনবোধে খুলে রাখা যায়। যে সব বীণা শোয়ানো অবস্থায় বাজানো হয় সেগুলোর মাথার তুম্বা আকারে বড় থাকে। সুরবাহার যন্ত্রে তুম্বা তৈরি করার জন্য লাউ চেপ্টা বা চেটাল আকারে কাটা হয়।

তুম্বা প্রস্তুতের জন্য শক্ত খোলের বিশেষ ধরণের লাউ গাছ রেখেই যতটা প্রয়োজন পরিপক্ক ও আকারে বড় করা হয়। এরপর ধুমায়িত আগুনের উপরে ঝুলিয়ে রেখে ফলটা শুকাতে দেওয়া হয়। কয়েক বছর ধরে রেখে দেওয়া হয় যাতে সেটা উপযুক্ত হতে পারে। তারপর আকৃতি অনুযায়ী কাটা হয় এবং ভিতরকার শাঁস বের করে নেওয়া হয়।

২। তবলী, চামড়ার ছাউনি –

তানপুরা, সেতার বা সুরবাহার তৈরি করবার জন্য নির্দিষ্ট মাপে কাটা লাউয়ের কাটা অংশটি পাতলা একটি কাঠের তক্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই পাতলা কাঠের অংশটির নাম তবলী। অর্থাৎ তবলী হলো তুম্বার উপরকার আচ্ছাদনী। তবলী প্রয়োজন অনুসারে কোনটা সমান্তরাল পাতের মত, শেষাংশ ঈষৎ বাঁকানো, কোন কোনটা অনেকটা কিছুটা গোলচে ধরণের, যেমন, তানপুরার তবলী।

তবলীর বদলে অনেক যন্ত্রে কাঠের তুম্বার উপরে চামড়ার ছাউনি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন, সরোদ। এস্রাজের ছোট কাঠের তুম্বাটির ছাউনি চামড়া দিয়ে করা হয়। কাঠের খোদাই করা সারেঙ্গী এবং দোতরার খোলের অংশেও থাকে চামড়ার ছাউনি।

Dhaka University Institutional Repository

৩। দণ্ড এবং পটরী –

তারযন্ত্রে খোল বা তুম্বা থেকে উপরের দিকে লম্বা গলার মত যে অংশ বের হয় তাকে দণ্ড বলে। সরোদ যন্ত্রে এই অংশ কাঠ খুদে তৈরি করা হয়। এটি নিচের কাঠের অংশের সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি কোণ আকৃতির হয়ে থাকে।

সেতার , এস্রাজ এই ধরণের যন্ত্রে দণ্ডটির প্রস্থ নিচ থেকে উপরে সমান, অর্থাৎ সমান্তরাল দু'টি রেখার মত। যন্ত্রের প্রয়োজন অনুসারে এই অংশ মাপমতো তৈরি করা হয়। এটি আলাদা তৈরি করে জুড়ে দেওয়া হয়। দণ্ডের উপরিভাগে সাধারণত অঙ্গুলি চালনার ব্যবস্থা করতে হয়। সেজন্য এই অংশটি চেপ্টা পাতের আকারে তৈরি করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে দণ্ড অংশটি ফাঁপা। এর পেছনের অংশ কিছুটা গোলচে ধরণের এবং সামনের অংশ বাজানোর সুবিধার্থে চেপ্টা কাঠের পাতে তৈরি। সেতার, সুরবাহার, এস্রাজ ইত্যাদি যন্ত্রে এর উপরে পর্দা বাঁধা হয় এবং পর্দার উপর দিয়েই তারগুলো মাথা থেকে গোড়া পর্যন্ত জুড়ে রাখা হয়।[৭] এই পর্দার উপরে বাঁ হাতের তার আঙুল দিয়ে টিপে ধরে বাজাতে হয়। অংগুলি চালনার এই অংশটিকে বাংলায় পটরী এবং ইংরেজিতে ফিংগারবোর্ড বলে। সরোদে ফিংগারবোর্ডে কোন পর্দা থাকে না এবং ফিংগারবোর্ডটি তৈরি হয় স্টিলের পাতলা পাত দিয়ে।

৪। গলু –

দণ্ড এবং লাউয়ের সংযোগ স্থলে কাঠের তৈরি গলার মত যে অংশটি থাকে সেটি গলু নামে পরিচিত। অনেকে একে কণ্ঠ বলেন। আবার ঘাড়ের মত দেখতে বলে এটি ঘাড়া নামেও পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে সেতারের এই অংশে বেশ কারুকাজ করা হয়।

তুম্বা, গলু এবং তবলীর সমষ্টিগত অংশটি ধ্বণিপ্রকোষ্ঠ বা সাউন্ড চেম্বার হিসেবে পরিচিত।[৮]

৫। বয়লা –

বয়লা হলো বাদ্যযন্ত্রের কান বা খুঁটি। এগুলো সাধারণত কাঠের তৈরি হয়। চেপ্টা বা গোলাকৃতির হতে পারে। তাতে নানা রকম কারিগরী কাজ করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। বয়লাতে যন্ত্রের তার সংযোজন করা হয়। বয়লার গায়ে একটি সূক্ষ ছিদ্র থাকে। তাতে তারের এক প্রান্ত ঢুকিয়ে দিয়ে তারটিকে বয়লার গায়ে

Dhaka University Institutional Repository

জড়িয়ে দেওয়া হয়। এই বয়লা ঘুরিয়ে অর্থাৎ মুচড়িয়ে তারের টান কম বেশি করে সুর মেলানো হয়। যন্ত্র অনুসারে বয়লা ছোট, মাঝারি অথবা বড় হয়। যেমন, তানপুরার বয়লা বেশ বড় এবং মোটা। সংখ্যায় চারটি। সেতারে সাতটি মাঝারি আকারের বয়লা থাকে। তরফের তার লাগানোর জন্য আরো কিছু সংখ্যক ছোট ছোট বয়লা থাকে। সরোদের মত ছোট যন্ত্র, যেগুলো কোলে নিয়ে বাজানোর উপযুক্ত, সেগুলোর বয়লা সেতারের বয়লার চেয়ে কিছুটা ছোট আকৃতির।

৬। মাথা –

দণ্ডের উপরের ভাগ অর্থাৎ ফিংগারবোর্ডের শেষ অংশকে মাথা বলে। এতে নানা ধরণের সজ্জামূলক এবং কারিগরী কাজ দেখা যায়। সেতারে এই অংশটি সমান হলেও সুরবাহারে তা ময়ূরের মাথার মত। সরোদে এই অংশে নানা অলঙ্কার দেওয়া হয়। প্রধাণ তারগুলো এই অংশে নানান রকম খুঁটি বা বয়লার সাহায্যে জড়ানো থাকে। এ কারণে ইংরেজিতে একে Peg box (পেগ বক্স) বলে। বয়লা থেকে তারগুলো ছোট একটা বেড়ার মত শক্ত পাতের উপর দিয়ে দণ্ডের উপর দিয়ে যন্ত্রের নিচের অংশের দিকে চলে যায়। যাওয়ার আগে আরেকটি দাঁড় করানো ছিদ্রযুক্ত পাতের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যায়। হাড়ের তৈরি বেড়ার মত অংশটিকে মেরু বলা হয়। ছিদ্রযুক্ত পাতটিকে বলা হয় তারগহন। যন্ত্রের প্রধাণ তারগুলো এর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে চালিত হয়।

৭। জওয়ারি, সওয়ারি বা ব্রিজ –

তারগুলো যন্ত্রের নিচের অংশে এসে তবলীর উপরে অবস্থিত একটি খুব ছোট আকারের চৌকীর উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। একে বলে জওয়ারি বা সওয়ারি। এটি দেখতে ছোট চৌকী অথবা ছোট সেতুর মত। ইংরেজিতে একে ব্রিজ বলা হয়। এটি সাধারণত হাড়ের তৈরি হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে প্লাস্টিক জাতীয় সিনথেটিক পদার্থের তৈরি ব্রিজের প্রচলন শুরু হয়েছে। সেতার, তানপুরা এ ধরণের যন্ত্রে এই ব্রিজটি এমন একটি বিশেষ স্থান যেখানে প্রয়োজন অনুসারে এর উপরের পাতটিকে ঘসে এমনভাবে সমান করা হয় যেন আঘাত পেলে তারটিতে কম্পন এবং ঝঙ্কার সৃষ্টি হতে পারে। অনেক যন্ত্রে যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানে তার বসানো হয় শুধু পাতের উপর দিয়ে, যেমন, সরোদ। আঘাতেই বাজে, জওয়ারির দরকার হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

৮। লেঙুট –

ব্রিজের উপর দিয়ে তার আসার পর এর পিছন দিকে আংটা বা হুকের মত একটি অংশে তার আটকে দেওয়া হয়। একে লেঙুট বলে। এর ইংরেজি নাম টেলপিস। লেঙুট ধাতু বা হাড়ের তৈরি হতে পারে।

৯। তার বা তন্ত্রী –

বিভিন্ন প্রকার ধাতু নির্মিত সূক্ষ্ম তার সেতার, সরোদ ইত্যাদি যন্ত্রে টান টান করে বাঁধা হয়। এই তারে আঘাত করে শব্দ উৎপন্ন করা হয়। প্রাচীন কালে পশুর অন্ত্র থেকে নির্মিত তন্ত্রী বাদ্যযন্ত্রে ব্যবহৃত হতো। একে বলা হয় অন্ত্রী তার (Gut string)। সারেঙ্গীতে এখনো অন্ত্রী তার ব্যবহৃত হয়। ইতিহাসে মুঞ্জ ঘাস, শন ইত্যাদির ব্যবহারের কথাও শোনা যায়। আধুনিক যুগে লোহা, পিতল, তামা ইত্যাদি ধাতু দিয়ে বাদ্যযন্ত্রের তার তৈরির প্রচলণ হয়।

১০। তরফ, চিকারী –

সেতারে যে প্রধান সাতটি তার থাকে তার মধ্যে শেষের দু'টি চিকন, দৈর্ঘ্যেও খাটো এবং এ দু'টি তার দণ্ডের একপাশে লাগানো দু'টি বয়লায় জড়ানো থাকে। এগুলোকে বলে চিকারী তার। এগুলো বাঁধা হয় মন্দ্র সা এবং তারার সা-তে। এ দু'টো তারে ঝালা বাজানো হয়।

অনেক সেতারে মূল সাতটি তার ছাড়াও মূল তারের নিচে আরেকটি সারিতে নয় থেকে তেরটি পর্যন্ত চিকন তার ছোট আরেকটি ব্রিজের উপর দিয়ে আটকানো হয়। এ তারগুলোকে বলা হয় তরফ। যে সেতারে তরফের তার থাকে তাকে বলা হয় তরফদার সেতার। [৯]

১১। পর্দা (সারিকা) –

পর্দা কখনো কখনো ঘাট নামেও পরিচিত। বীণার পর্দা সারিকা নামে অভিহিত ছিলো। তাই পর্দা সারিকা নামেও পরিচিত। সেতার, সুরবাহার, এস্রাজ প্রভৃতি যন্ত্রের একটি বিশেষ অংশই পর্দা। স্টিলে তৈরি সামান্য বাঁকানো সরু দণ্ডের মত। পর্দা পরিমাপ অনুসারে পটরীর উপরে নানান স্বরে বাঁধা থাকে। পটরীর বুকে একটি একটি করে পর্দা মুগা সূতা বা নাইলনের সূতা দিয়ে বাঁধা হয়। সাধারণত সেতারে

Dhaka University Institutional Repository

ষোলটি পর্দা থাকে, সংখ্যার তারতম্যও হয়। শুদ্ধ স্বরকে প্রয়োজনে কোমল স্বরে পরিবর্তিত করতে হলে পর্দা নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরিয়ে স্বর পরিবর্তনের রীতি আছে।

সরোদ যন্ত্রে পর্দা থাকে না। বেহালাতেও থাকে না।

১২। মান্‌কা –

মান্‌কা সাধারণত রঙীন কাচ দিয়ে অথবা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়। তবে হরিণের শিং এবং হাতীর দাঁত দিয়েও তৈরি করা যায়। মান্‌কা বড় একুট পুঁতির মত, এর এপিঠ ওপিঠে একটা সরু ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তার ঢুকিয়ে মান্‌কাটিকে সওয়ারীর নিচে তবলীর উপর আটকিয়ে রাখা হয়। সাধারণত সেতার ও সুরবাহার যন্ত্রের প্রধাণ তার বা নায়কী তারে মান্‌কা ব্যবহার করা হয়। তবে একাধিক তারেও ব্যবহার করা চলে। বয়লা মুচড়ে তারে সুর বাঁধবার পরও সূক্ষ্মভাবে সুর মেলাবার জন্য (Fine tuning) মান্‌কা আবশ্যক।

১৩। মিজরাব ও জওয়া –

মিজরাব আরবী শব্দ। আরবী ভাষায় আঘাত করাকে 'জার্ব' বলে। 'জার্ব' শব্দ থেকে মিজরাব শব্দটির উৎপত্তি। এটি দিয়ে তারে আঘাত করে শব্দ উৎপন্ন করা হয়। ইস্পাতের শক্ত তার দিয়ে মিজরাব তৈরি হয়। ডান হাতের তর্জনীতে এটি পরে এর সাহায্যে সেতার, সুরবাহার, একতারা প্রভৃতি বাজাতে হয়।
সরোদ বাজাতে হয় জওয়া দিয়ে। এটিও আরবী শব্দ। এটি ত্রিভুজাকার একটি প্লেকট্রাম। নারকেলের মালা ত্রিভুজাকারে কেটে জওয়া তৈরি করা হয়। যে অংশটি দুই আঙুলে চেপে ধরতে হয় সে অংশটিতে মোম ও পাতলা কাপড়ের প্রলেপ দেওয়া হয় পিছলানো প্রতিরোধ করার জন্য।

১৪। ছড় –

সরল বা ধনুকাকৃতির পাতলা দণ্ডের সঙ্গে সমান্তরাল করে ঘোড়র লেজের চুল বেঁধে ছড় তৈরি করা হয়। ডান হাতে ছড় ধরে এর ঘোড়ার লেজের চুলের অংশ দিয়ে বেহালা, এস্রাজ, সারেঙ্গী প্রভৃতি যন্ত্রের তারে ঘর্ষন করে যন্ত্রগুলো বাজাতে হয়। [১০]

.. ..

Dhaka University Institutional Repository

১। Roy, Ajoi Sinha : "Musings on Music", West Bengal State Music Academy, 1992, পৃঃ ৩৫।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬

৩। দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ১৯৯১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, পৃ ঃ ৭।

৪। রায়, সুকুমার ঃ "ভারতীয় সংগীত ইতিহাস ও পদ্ধতি", ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃঃ ১৬।

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

৬। Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ৫।

৭। রায়, সুকুমার ঃ "সংগীত পরিচয়", ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃঃ ৬০।

৮। বিশ্বাস, পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস ঃ "সপ্ত তন্ত্রিকা তত্ত্ব", দীপায়ন, কলিকাতা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬।

৯। রায়, সুকুমার ঃ "সংগীত পরিচয়", ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃঃ ৬২।

১০। খান, মোবারক হোসেন ঃ "সংগীত মালিকা", বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২০০৩, পৃ ঃ ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায় – বাদ্যযন্ত্রের আকৃতি ও নির্মাণকৌশলের বিবরণ ঃ

(ক) বাদ্যযন্ত্রের কাঠামো বিশ্লেষণ

(খ) বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তনের কালানুক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা

বাদ্যযন্ত্রের আকৃতি ও নির্মাণকৌশলের ধারাবাহিক বা কালানুক্রমিক আলোচনা করতে হলে যে বিষয় সম্পর্কে প্রথমে জানা দরকার তা হচ্ছে বাদ্যযন্ত্রের প্রকৃতি। কারণ বাদ্যযন্ত্রের প্রকৃতি এবং বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণকৌশলের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাদ্যযন্ত্রের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে সমগ্র বাদ্যযন্ত্রকে মূল তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন,

১। ড্রোন (Drone) বা সুর ধরে রাখার যন্ত্র

২। পলিকর্ড (Polychord) অর্থাৎ যে যন্ত্রে একটি স্বর বাজানোর জন্য একটি তার ব্যবহৃত হয় এবং

৩। মনোকর্ড (Monochord) অর্থাৎ যে যন্ত্রে একটি তার দিয়ে সব স্বর বাজানো যায়।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে বাদ্যযন্ত্রের আকৃতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সহজবোধ্য হবে।

ড্রোন ঃ

এ ধরণের বাদ্যযন্ত্র কোন রাগ বা সুর সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয় না, বরং সুর ধরে রাখা ও তালের সমতা রক্ষার জন্য প্রযুক্ত হয়।[১] যেমন একতারা ও তানপুরা। একতারায় একটি মাত্র তারই থাকে। যন্ত্রটির নিচের দিকে ছোট আকৃতির একটি লাউয়ে চামড়ার ছাউনি দেওয়া থাকে। ছাউনির সাথে কাঠ বা বাঁশের দন্ড আটকানো হয়। দন্ডটি খুব বেশি মোটা নয়। লাউটি অনুনাদক হিসেবে কাজ করে। দন্ডটি লাউয়ের নিচের দিকে একটু বেরিয়ে থাকে। সেই বের হয়ে থাকা অংশে একটা ছোট আঙটা লাগানো থাকে। সেখান থেকে একটা তার ছাউনির ওপর দিয়ে দন্ডের প্রায় শেষ মাথা পর্যন্ত প্রসারিত। ছাউনির ওপরে এটি একটি ছোট ব্রিজের ওপর দিয়ে আসে। দন্ডের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি এটি একটি খুঁটির সাহায্যে আটকানো হয়। খুঁটিকে মোচড় দিয়ে তারটিকে ইচ্ছামত ঢিলা বা আঁটো করা যায়। গানের সুরের সাথে মিল রেখে এই তারের সুর বাঁধা হয়। গান গাওয়ার সময় ডান হাতের সাহায্যে টোকা দিয়ে তালে তালে শব্দ উৎপন্ন করা হয়। ফলে ছন্দোময় একটি মিষ্টি ঝঙ্কার সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

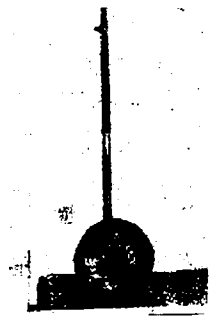

চিত্র-৪ ঃ একতারা

তুলনামূলকভাবে একটু বড় আকারের লাউ দিয়ে তৈরি যন্ত্র 'লাউ' নামেই পরিচিত। গ্রাম বাংলার বাউল এবং বৈরাগীদের কাছে এটি খুবই আদরণীয়। লাউয়ের নিচের দিক কেটে চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয়। ওপরের অংশ সমান করে কাটা হয়। লাউয়ের তৈরি এই খোলের দু'পাশে বাঁশের চটা লাগানো হয়। তবে তার আগে বাঁশের দন্ডটিকে দু'ভাগে চিরে ফেলা হয়। বাঁশের জোড়া বাঁ গিঁটের অংশটি অবিচ্ছিন্ন রেখে তার নিচ থেকে চিরে দু'ভাগ করতে হয়। এরপর চেরা অংশ বা চটা দু'টো লাউয়ের দু'পাশে শক্ত করে আটকানো হয়। দন্ডের উপরের অংশে গাঁটের ওপরে তার আটকানোর জন্য একটি খুঁটি থাকে। এই খুঁটিতে তার জড়িয়ে বাঁশের চটা দু'টির মধ্য দিয়ে তারটি লাউয়ের খোলের ভেতর দিয়ে চামড়ার নিচ পর্যন্ত টেনে নিয়ে একটি চাকতির সাহায্যে আটকিয়ে দেওয়া হয়। খুঁটি মুচড়ে গানের সুরের সাথে তারের সুর মেলানো হয়। এরপর ডানহাতের তর্জনীতে মিজরাব লাগিয়ে সেটির সাহায্যে তারে আঘাত করে বাজাতে হয়। একতারার চেয়ে এটি বেশি বৈচিত্রপূর্ণ এই কারণে যে, তারে আঘাত করার পরই বাঁশের চটায় একবার চাপ দেওয়া হয় আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে তার ও চামড়ার ছাউনির চাপের যে পরিবর্তন হয় তা স্বরের উচ্চ-নিম্নতা সাধন করে। চাপ দিলে তারটি ঢিলে হয় এবং সুর নেমে যায়। আবার ছেড়ে দিলে যে সুরে বাঁধা থাকে সেই সুরে বাজে। ফলে ছন্দময় একটি সুরেলা শব্দ সৃষ্টি হয়।

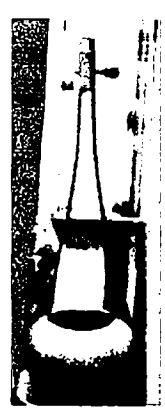

চিত্র-৫ ঃ লাউ

Dhaka University Institutional Repository

সুর মেলানো বা সুর ধরে রাখার যন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তানপুরা। তানপুরা স্বর বৈভবে অতুলনীয়।এর প্রতিটি তার এমন স্বর-বৈচিত্র সৃষ্টি করে যার কোন তুলনা নাই, এমনকি কোনভাবে বিশ্লেষণ করেও বোঝানো সম্ভব নয়, কিন্তু মাত্র চারটি বা পাঁচটি তার থেকেই পূর্ণ সপ্তকের আবহ সৃষ্টি হয়। এই চারটি তার থেকে সা, পা এবং কখনো এর সাথে রাগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আরো একটি বা দু'টি সুর উৎপন্ন করা হয়। এই দু'টি বা তিনটি স্বর একত্রে বেজে উঠলে শুধু দু'টি বা তিনটি স্বর নয়, যেন সাতটি সুরের রেশ একত্রে বেজে ওঠে, ফলে অনেকটা গুঞ্জনের মত মনে হয়। ইংরেজিতে যাকে 'ড্রোন' বলে তানপুরার সুর তা থেকেও স্বতন্ত্র। সে কারণে অনেকের মতে তানপুরাকে শুধু 'ড্রোন' বললে ঠিক বলা হয় না। কারণ প্রকৃতপক্ষে এর অবদান আরো বেশি। শুধু মূল সুরটা ধরে রাখা নয়, তার চেয়েও বেশি এর কার্যকারিতা। এটি চক্রাকার প্রবাহের মাধ্যমে সুরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। সুরের এই ঐশ্বর্যকে পটভূমি হিসেবে রেখে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করা হয়ে থাকে। তানপুরার গঠন অতি সাধারণ। প্রায় নব্বই সেন্টিমিটার চওড়া বড় লাউয়ের খোল দিয়ে তুম্বা তৈরি হয়। লাউটি উপযুক্ত আকারে কেটে এর খোলা অংশ পাতলা কাঠের তক্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। একে তবলী বলো হয়। একটা ছোট্ট কাঠের গলা জুড়ে দেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে একটি ডান্ডা সংলগ্ন করা হয়। ডান্ডাটিকে বলে পটরী। লাউয়ের নিচের অংশে একটি হাড়ের তৈরি লেঙুট আটকানো হয়। তবলীর ঠিক মধ্যখানে কাঠের তৈরি একটা ব্রিজ বা সওয়ারি আঠা দিয়ে লাগানো হয়। তানপুরার উপরের দিকে দু'টো হাড়ের তৈরি তারগহন পটরীর সঙ্গে আঠা দিয়ে যুক্ত করা হয়। তারপরে দন্ডের দু'পাশে এবং পটরীর উপরের অংশে দু'টো ছিদ্র করে কাঠের তৈরি চারটি খুঁটি বা বয়লা লাগানো হয়। চারটি বয়লা থেকে চারটি তার দু'টি তারগহনের ভিতর দিয়ে তবলীর উপরে অবস্থিত সওয়ারি অতিক্রম করে লেঙুটের সাথে সংযোজন করা হয়। গান গাওয়ার সময় মধ্যমা ও তর্জনীর সাহায্যে তারে ক্রমান্বয়ে আঘাত করে শব্দ উৎপন্ন করা হয়। ফলে সুন্দর একটি সুরের রেশ তৈরি হয়। একক বাদ্যযন্ত্র বাজাবার সময় একজন তানপুরা বাদক মূল যন্ত্রসংগীত শিল্পীর সাথে সঙ্গত করে থাকেন।

চিত্র-৬ ঃ তানপুরা

Dhaka University Institutional Repository

পলিকর্ড ঃ

তানপুরার মত এটি শুধু সুর ধরে রাখার যন্ত্র নয়। এতে সুর বাজানো যায়, তবে একটি স্বরের জন্য একটি তার রাখতে হয়।[২] ইংরেজিতে হার্প বলতে যে ধরণের যন্ত্র বোঝায় এটি আসলে সেই যন্ত্র। যতগুলো স্বর বাজাতে চাই ততগুলো তার সংযোজন করতে হবে। একটি তার থেকে পৃথক পৃথক সুর বাজানো যাবেনা, যেমন করে সেতার বাজানো হয়। "একটি তার-একটি স্বর" এটি হচ্ছে এই জাতীয় যন্ত্রের মূল তত্ত্ব। এই ধরণের যন্ত্রের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস সম্ভবত শিকারীর ধনুক। ধনুকের ছিলার টঙ্কার ধ্বণি আদিম মানুষকে তার সংগীত উপযোগিতা সম্পর্কে কোন ধারণা দিয়ে থাকতে পারে। একটি মাত্র তার হওয়ায় সূচনায় এটি শুধু টানা সুর হিসেবে ব্যবহৃত হকো। একই ধনুকে অনেকগুলো তার যোজনা করে বিভিন্ন স্বর উৎপন্ন হলো এবং সৃষ্টি হলো হার্প। [৩]

পাশ্চাত্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের হার্প কম-বেশি ধনুকাকৃতির। আমাদের দেশে আধুনিক যুগে পলিকর্ডের উদাহরণ হচ্ছে সন্তুর এবং সুরমন্ডল।

চিত্র-৭ ঃ পলিকর্ড জাতীয় যন্ত্র ঃ সুরমণ্ডল

মনোকর্ড ঃ

এই জাতীয় যন্ত্রে সমগ্র সুর বাজানোর জন্য একটি তারই যথেষ্ট। হয়তো বাদ্যযন্ত্রটিতে একাধিক তার থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটি তার অপরগুলো ছাড়াই স্বতন্ত্রভাবে সুর সৃষ্টি করতে পারে। মনোকর্ড পর্দাযুক্ত বা পর্দাবিহীন হতে পারে, লম্বা গলার বা ছোট গলার হতে পারে, তার টেনে বাজানোর অথবা ধনুর্যন্ত্র হতে পারে, এবং প্রকৃতিতে তারা অসংখ্য হতে পারে।[৪]

প্রত্নতত্ত্বের আবিস্কার বিশ্লেষণ করে গবেষকরা জানতে পেরেছেন যে, এদেশের প্রথম যুগের বীণা ছিলো পলিকর্ড ধরণের। অর্থাৎ একটি তার - একটি সুর। পরবর্তীকালে এর বিবর্তন সাধিত হয় এবং ধরণ

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তিত হয়। ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক ধরণের বীণা পরিণত হয় আধুনিক মনোকর্ড যন্ত্রে। যেমন, স্বরস্বতী বীণা কিংবা সেতার।

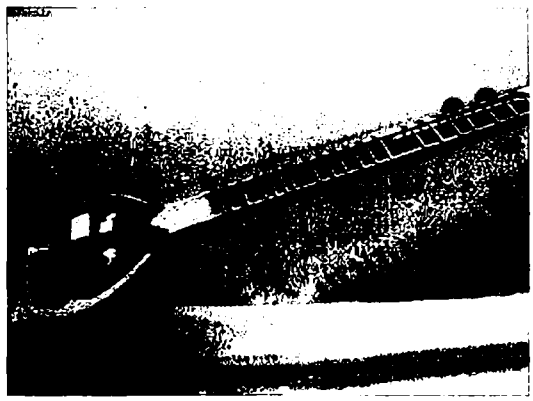

চিত্র-৮ ঃ মনোকর্ড জাতীয় যন্ত্র ঃ সেতার

বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাসের যে সকল প্রামাণ্য পুস্তক বাংলায় রচিত হয়েছে সেখানে যন্ত্রের আকৃতি ও নির্মাণকৌশল নির্বিশেষে অর্থাৎ পলিকর্ড মনোকর্ড নির্বিশেষে সবগুলোকেই বীণা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলায় সবকটিকে বীণা বলা হলেও আকারগত প্রকারভেদ অনুসারে এগুলোকে হার্প (Harp), লিউট (Lute) অথবা জিথার (Zither) ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে দেখা যায় কোন নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে হার্প জাতীয় যন্ত্র, আবার অন্য কোন সময়ে লিউট, কখনো বা জিথার জাতীয় যন্ত্র প্রাধাণ্য বিস্তার করেছে। প্রাচীন একতারের তারযন্ত্র কিভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অথবা বলা যায় বার বার রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিভাবে আধুনিক সেতার, সরোদ বা এস্রাজের পর্যায়ে পৌছালো তা বুঝবার জন্য হার্প, লিউট, জিথার ইত্যাদির স্বরূপ জানা অত্যন্ত জরুরী। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সাথে সমন্বয় রেখে এখানে একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা দেওয়া হলো।

(ক) বাদ্যযন্ত্রের কাঠামো বিশ্লেষণ

হার্পঃ

ধনুকাকৃতির পলিকর্ড, যার ইংরেজি নাম হার্প, বাংলায় বীণাও বলা হয়, এটি হচ্ছে পরিচিত সব থেকে প্রাচীন তত-যন্ত্র। একটি ধনুকে একটি তার যোজনা করেলে তাতে টোকা দেয়ে একটি স্বর উৎপন্ন করা যায়। একই ধনুকে অনেকগুলো তার যোজনা করলে বিভিন্ন স্বর উৎপন্ন হয়। এভাবে সৃষ্টি হয় হার্প।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই একটি ধনুকের গুণের সঙ্গে অনেকগুলো সমান্তরাল তার যোজনা করলে প্রাথমিক ধরণের একটি হার্পের কাঠামো পাওয়া যায়। ইতিহাসের প্রথম যুগে হার্প জাতীয় যন্ত্রের গঠন অনুন্নত ধরণের ছিলো, শব্দ প্রকোষ্ঠ বলে তেমন কিছু ছিলো না। পরবর্তী সময়ে একেবারে শিকারীর ধনুকের মত তৈরি না করে ফাঁপা দন্ড দিয়ে এটি তৈরি হতে লাগলো। ফাঁপা অংশটি হলো শব্দ প্রকোষ্ঠ বা অনুনাদক এবং এর সাথে একটি ডান্ডা জুড়ে দিয়ে ধনুকাকৃতি করা হলো। এরপর এই ধনুকাকৃতির যন্ত্রে আড়াআড়িভাবে তার যোজনা করে পাওয়া গেল হার্প জাতীয় বীণা। এটি হলো প্রাচীন আমলের হার্প সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা। [৫]

এখন আমরা আলোচনা করব আধুনিক যুগের সংগীত শাস্ত্রে হার্প বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়। হার্প হচ্ছে এক প্রকার তারের যন্ত্র যেখানে তারগুলো শব্দপ্রকোষ্ঠের সাথে প্রায় খাড়াভাবে (লম্ব) অবস্থান করে।[৬]

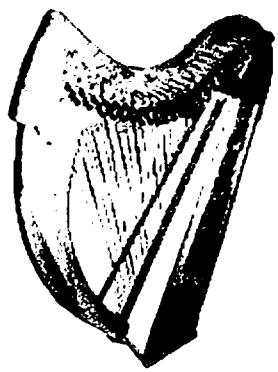

চিত্র-৯ ঃ ছোট আকারের হার্প

হার্পকে একটি বাদ্যযন্ত্র না বলে একে বাদ্যযন্ত্রের একটি গোত্র বলা যেতে পারে। এটি একটি পলিকর্ড জাতীয় যন্ত্র, অর্থাৎ একটি তারে একটি স্বর বাজে। এভাবে যতগুলো স্বর বাজবে ততগুলো তার থাকবে। উপমহাদেশীয় ইতিহাসের গোড়ার দিকে বীণা হিসেবে যতগুলো যন্ত্র প্রচলিত ছিলো সবই ছিলো হার্প শ্রেণীর। প্রাচীন ইতিহাস ও সংগীত শাস্ত্রে দু'রকম হার্পের কথা গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি সাত তারযুক্ত, অপরটি নয় তারযুক্ত। সাত তারযুক্ত বীণা সপ্ততন্ত্রী বীণা নামে পরিচিত। এতে সাতটি তার থাকতো, অন্যটি বিপঞ্চীবীণা, এতে নয়টি তার থাকতো। প্রথমটি আঙুল দিয়ে বাজানো হতো। পরেরটি বাজানো হতো Plectrum বা ত্রিভুজাকৃতির কাঠের টুকরা দিয়ে। [৭]

Dhaka University Institutional Repository

ভারহুত ও বুদ্ধগয়ার প্রাচীন স্তম্ভে পাঁচ তারযুক্ত হার্প দেখা যায়। অবশ্য বেশি দেখা যায় সাত তারযুক্ত হার্প। যেমন, অজন্তার (তৃতীয় খ্রিঃ পূঃ) সন্নিকটে পিতলখোরা, মধ্যপ্রদেশের সাঁচী (দ্বিতীয় খ্রিঃ পূঃ), অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতী ও নাগার্জ্জুনকোন্ডার (তৃতীয় খ্রিস্টাব্দ) ভাস্কর্য ও উৎকীর্ণ শিল্পে।

উপমহাদেশে প্রাপ্ত বেশিরভাগ হার্প ধনুকাকৃতি বা বাঁকানো (Arched Harp)। তবে অন্য ধরণের হার্পও ছিলো বা রয়েছে। যেমন প্রাচীনকালে একটি যন্ত্র ছিলো মত্তকোকিলা, যা বর্তমানের সুরমন্ডলের অনুরূপ।

লাইয়ার ঃ

হার্প গোত্রের খুব কাছাকাছি ধরণের আরেকটি গোত্র হচ্ছে লাইয়ার (Lyre) বা লাইয়ার জাতীয় যন্ত্র। হার্পের সাথে চেহারায় অনেক মিল থাকলেও লাইয়ার আলাদা এ কারণে যে, হার্পের তারগুলো শব্দ প্রকোষ্ঠ থেকে খাড়াখাড়িভাবে উঠে আসে, লাইয়ার-এর ক্ষেত্রে তা হয় না। এখানে একটা শব্দ প্রকোষ্ঠ তৈরি করার পর সেটির দুই প্রান্ত থেকে দু'টো বাহু বের হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। দু'টো বাহুকে প্রায় শেষ প্রান্তের কাছাকাছি জায়গায় একটা ক্রসবার সংযুক্ত করে রেখেছে। এই ক্রসবারটিকে বলে Yoke (ইয়ক)। অপরদিকে নিচে যেখানে শব্দ প্রকোষ্ঠ আছে সেখানে ছোটখাটো আরেকটা ক্রসবার লাগানো হয় যেটা আসলে তারের ব্রিজ বা সওয়ারি হিসেবে কাজ করে। এই ব্রিজের নিচে বা পেছনের অংশে সংযুক্ত একটা টেলপিস বা লেঙুটে তারগুলো লাগানো হয়। এখান থেকে ব্রিজের উপর দিয়ে তারগুলো উপরে উঠে একেবারে ইয়ক পর্যন্ত চলে যায়। ইয়কের সাথে খুঁটির সাহায্যে অথবা অন্য কোন উপায়ে তার লাগানো থাকে। আরেকটি বিষয়ের বিবেচনায় লাইয়ার হার্পের চেয়ে আলাদা, তা হলো, হার্প বাজাতে হয় আঙুলের সাহায্যে তারে টোকা দিয়ে। কিন্তু লাইয়ার বাজাতে হয় প্লেকট্রাম দিয়ে আঘাত করে (যেমন করে গিটার বাজাতে হয়)। তাছাড়া সাধারণভাবে লাইয়ার হার্পের চেয়ে আকারে অনেক ছোট হয়ে থাকে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

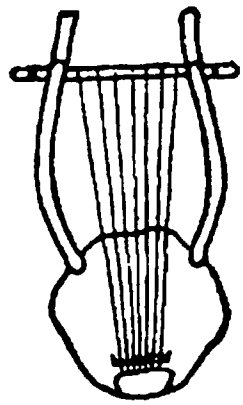

চিত্র-১০ ঃ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পাত্রের গায়ে আঁকা লাইয়ারের কাঠামো

চিত্র-১১ ঃ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পাত্রের গায়ে আঁকা লাইয়ারের ছবি

এই উপমহাদেশে সম্ভবত লাইয়ার বাদ্যযন্ত্রটি ছিলো না। অথবা খুব কম প্রচলিত ছিলো। ড. বি চৈতন্য দেব তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণায় কেবল সিন্ধুসভ্যতার হায়ারোগ্লিফস্-এ লাইয়ার জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের অস্তিত্ব অনুমান করতে পেরেছেন। [৯]

Dhaka University Institutional Repository

নিচে প্রাচীন এবং আধুনিক দু'টি লাইয়ার যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হলো।

চিত্র-১২ ঃ ইরাকের খননকার্য থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন লাইয়ার

চিত্র-১৩ ঃ আধুনিক লাইয়ার

লিউট ঃ

লিউট বলতে সাধারণভাবে বোঝায় তারের যন্ত্র, যে যন্ত্রে তারে টোকা দিয়ে বা আঘাত করে বাজাতে হয় এবং যার নিচের অংশটা গোল, এই গোল অংশের সাথে লম্বা অংশ লাগানো থাকে যাতে পর্দা বা সারিকা লাগানো থাকে। তবে সব যন্ত্রে পর্দা নাও থাকতে পারে। তারগুলো তবলীর উপর দিয়ে গিয়ে লাউ বা কাঠের তৈরি শব্দ প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করে এর নিচের দিকে লাগানো একটি টেলপিস বা লেঙুটে সংযুক্ত থাকে। [১০]

লিউট সম্পর্কে ড.বি.চৈতন্যদেব বলেছেন, এটি সে ধরণের বাদ্যযন্ত্র যেখানে ফিংগারবোর্ডটি সাউন্ড বক্সের বর্ধিত অংশ মাত্র। [১১]

বর্তমানকালে বহুল ব্যবহৃত তানপুরা থেকে শুরু করে সেতার, সরোদ এবং এস্রাজ সবই লিউট গোত্রের যন্ত্র। লিউট জাতীয় যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো এতে ছোট বা বড় গলা থাকবে। এই অংশটি সরাসরি শব্দ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকোষ্ঠের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এই নির্মাণ কৌশলটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এই কারণে যে, এ থেকেই সেতার, সরোদ তথা বীণা জাতীয় যাবতীয় 'লিউট' যন্ত্রের সূচনা। [১২]

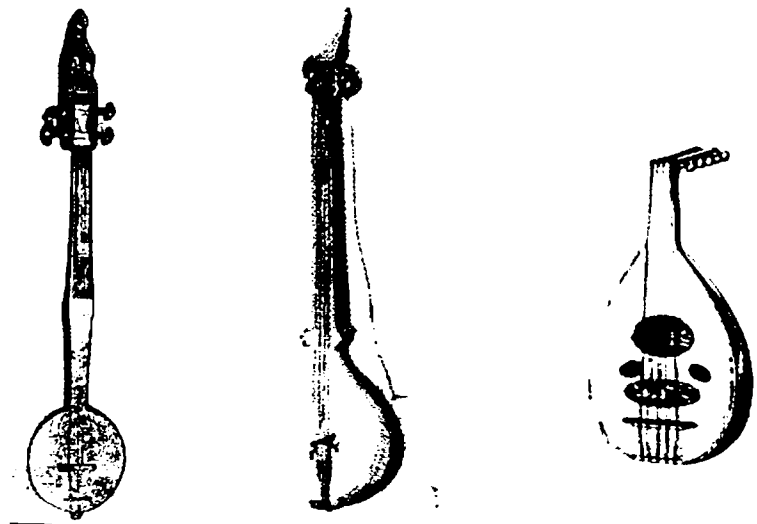

চিত্র-১৪ ঃ লিউট জাতীয় কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র

প্রাচীনত্বের দিক থেকে হার্প নিঃসন্দেহে প্রাচীনতর লিউট-এর চেয়ে। তবে ঠিক কখন কবে লিউট আবিস্কার হলো তা সঠিকভাবে বলা যায় না। এটুকু বলা যায়, যে খ্রিষ্টীয় দশম শতকের পর লিউট জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। [১৩]

জিথার ঃ

জিথার গোত্রীয় যন্ত্রে শব্দ প্রকোষ্ঠের উপরে তারগুলো ছড়ানো থাকে। এদের একীভূত উৎস থাকে না এবং তারগুলো সাধারণত শব্দ প্রকোষ্ঠ থেকে দূরে কোথাও নিয়ে আটকানো হয় না। একীভূত উৎস বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তারগুলো নির্দিষ্ট একটি টেলপিস থেকে আসে না। প্রত্যেকটা তার আলাদাভাবে থাকে। লাইয়ার এবং লিউট গোত্রের যন্ত্রে কিন্তু একটি মাত্র টেলপিসে সবগুলো তার আটকানো থাকে। এই যন্ত্রে আনুনাদক সব সময় ফিংগারবোর্ডের নিচে থাকবে। [১৪]

আমাদের দেশের বাইরে চীন, জাপান ও কোরিয়ায় জিথার জাতীয় যন্ত্র খুব জনপ্রিয়। চাইনিজ জিথার, কোটো, কাইয়াগাম ইত্যাদি নামের জিথার জাতীয় যন্ত্র সেখানে অতি প্রচলিত।

Dhaka University Institutional Repository

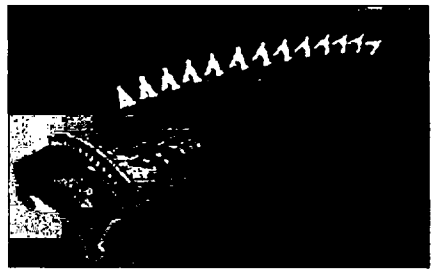

চিত্র-১৫ ঃ কোটো

পাশ্চাত্যে জিথার গোত্রীয় যন্ত্রের একটি উদাহরণ হচ্ছে স্যলটারি। চিত্রে দু'ধরণের স্যলটারি দেখানো হলো, একটি আঙুলের সাহায্যে বাজাতে হয়(Plucked Psaltery), অপরটি ছড় দিয়ে বাজাতে হয়(Bowed Psaltery)।

চিত্র-১৬ ঃ Plucked Psaltery

চিত্র-১৭ ঃ Bowed Psaltery

জিথার গোত্রীয় পাশ্চাত্য যন্ত্রের মধ্যে একটি উদাহরণ হচ্ছে পিয়ানো। এটি চাবিযুক্ত জিথার। ফলে নির্মানকৌশলের দিক থেকে এটি জিথারের সকল শর্ত পূরণ করলেও দেখতে একবারে আলাদা এবং প্রাচ্যদেশীয় জিথারের চেহারার সাথে এর তুলনাই চলে না।

আমাদের সংগীতের ইতিহাসে বিচিত্রবীণা জিথারের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এটি পরদাবিহীন জিথার। ফিংগারবোর্ড চওড়া, প্রায় সওয়া মিটার দীর্ঘ, নিচের অংশে দু'টি বড় লাউ, চওড়া সওয়ারি, অন্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রান্তে কিনারা ও চারটি খুঁটি, তাতে বাজাবার তারগুলো সংলগ্ন। আরো দু'টো তার থাকে। তাদের বলে চিকারী। মূল তারগুলো আঙুল দিয়ে বাজানো হয়। তবে আঙুলে তারের মিজরাব পরা থাকে। সুর সৃষ্টির জন্য একটা কাচের গোলা তারগুলোর উপর চেপে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

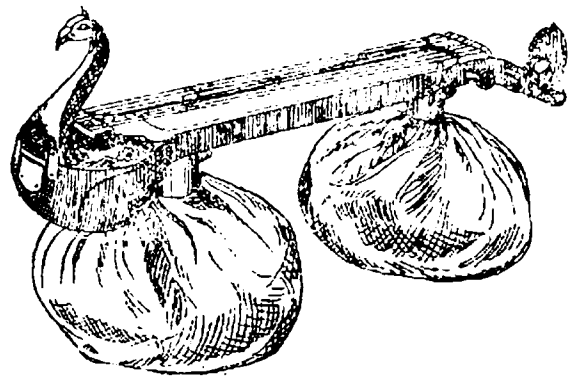

চিত্র-১৮ ঃ বিচিত্র বীণা

বিচিত্র বীণায় পর্দা লাগালে পর্দাযুক্ত জিথার পাওয়া যায়। 'কিন্নরী' এবং 'রুদ্রবীণা' এই শ্রেণীর বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র। রুদ্রবীণা বুকের কাছে ধরে রেখে বাজাতে হয়। এর একটা বাঁশের গলা থাকে, তাতে চার থেকে ছয়টা পর্দা মোম মিশ্রিত এক প্রকার আঠা দিয়ে লাগানো থাকে। দু'টো লোহার তার আলাদা আলাদাভাবে এর উপর দিয়ে টেনে নেওয়া হয়। প্রথমটি সুরের, দ্বিতীয়টি একটানা স্বর ধরে রাখার জন্য। এগুলোর নিচে ছোট দু'টো লাউ, নিচের দিকটা কাটা এবং বাঁশের গলার কাছে লাগানো। ডান হাত দিয়ে তারগুলো টানা হয় আর বাঁ হাত দিয়ে থামানো হয়।[১৫] এখানে থামানো বলতে ফিংগার বোর্ডের উপরে আঙুল দিয়ে চেপে তারের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করে উচু এবং নিচু স্বর উৎপন্ন করা বোঝানো হয়েছে।

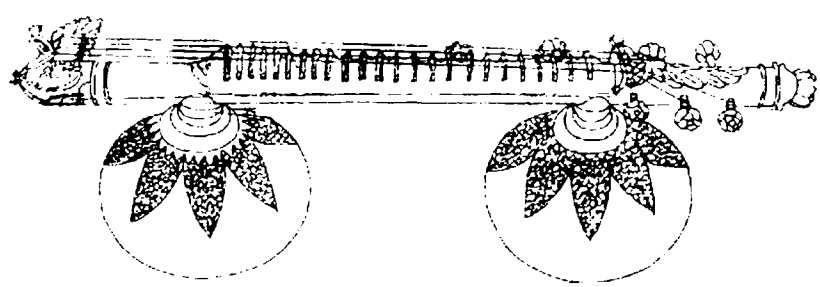

চিত্র-১৯ ঃরুদ্র বীণা

Dhaka University Institutional Repository

কিন্নরী বীণাও পর্দাযুক্ত জিথার। লঘু কিন্নরীতে প্রায় পঁচাত্তর সেন্টিমিটার দীর্ঘ বাঁশের ফিংগারবোর্ড এবং দু'টো লাউ থাকে। পর্দার সংখ্যা চৌদ্দটি। বৃহতী আরো শক্ত বাঁশের তৈরি এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় বিশ সেন্টিমিটার। লাউ তিনটি। [১৬]

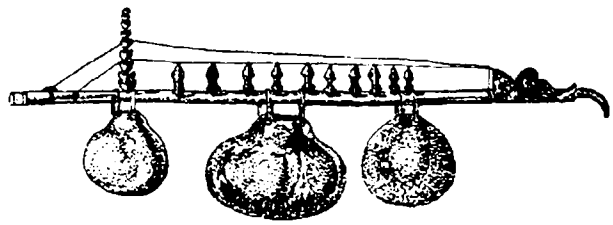

চিত্র-২০ ঃ কিন্নরী বীণা

জিথার গোত্রীয় যন্ত্রগুলোর মধ্যে পিয়ানোকে বলা হয় চাবিযুক্ত জিথার এবং এটি সবার চেয়ে আলাদা। অন্যান্য জিথারগুলোর মধ্যে কোনটি লম্বা আকৃতির, কোনটি আবার তেমন লম্বা নয় বরং চওড়া। বিদেশী জিথারগুলোর তুলনায় উপমহাদেশীয় জিথার গুলো লম্বাটে ধরণের হয়ে থাকে। এগুলো সাধারণত দণ্ডাকৃতির। সেজন্য আলোচনার সুবিধার্থে এগুলোকে দণ্ডাকৃতি জিথার (Stick Zither) বলে উল্লেখ করা হয়।

এতক্ষণ বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হলো তার সারমর্ম হিসেবে বলা যায়, সব তারের যন্ত্রকে বীণা বলে উল্লেখ করা হলেও এদেরকে পৃথক কয়েকটি গোত্রে ভাগ করা যায়। নির্মানকৌশলে এদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। উপমহাদেশীয় ভূখন্ডে প্রাপ্ত মূল তিনটি গোত্রের মধ্যে অর্থাৎ হার্প, লিউট এবং জিথারের মধ্যে হার্প একেবারেই আলাদা – লিউট কিংবা জিথার থেকে। কারণ এটি পলিকর্ড। বাকী দু'টো মনোকর্ড। এই দু'য়ের মধ্যেও পার্থক্য আছে। লিউট আর জিথারের মধ্যে লিউটের ছোট অথবা লম্বা গলা থাকে। জিথারের কোন গলা থাকে না। রুদ্র বীণাকে যদি উদাহরন হিসেবে দেখা হয়, তাহলে বলা যায় বাঁশের তৈরি লম্বা ফিংগারবোর্ডটিই এর দেহ। আলাদা কোন গলা নাই। শব্দ প্রকোষ্ঠ বা লাউ দু'টি দেহের নিচে অবস্থান করে। জাপানি বাদ্যযন্ত্র কোটো-তে এই বৈশিষ্ট্য আরো স্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

বাদ্যযন্ত্রের কাঠামো বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ধারণা ঃ

ধনুকাকৃতির হার্প হচ্ছে উপমহাদেশের প্রাচীনতম হার্প। এই হার্পের কিছুটা উন্নততর সংস্করণ পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয় যা আমাদের দেশের কাছাকাছি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বর্তমানকালেও প্রচলিত রয়েছে। এ ধরণের হার্পের মূল কাঠামোর চিত্র নিচে দেওয়া হলো।

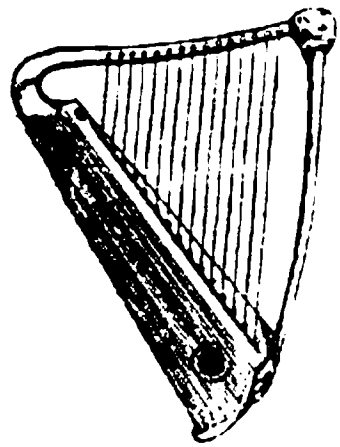

চিত্র-২১ ঃ ছোট আকারের হার্প-এর মূল কাঠামো

আমাদের দেশে এ ধরণের হার্পের ক্রমবিবর্তন হয় নি। হার্পের পরবর্তী সময়ে জিথার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং তারপর লিউট জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রবল জনপ্রিয়তা এবং বাদনরীতির উৎকর্ষ সাধন হচ্ছে এর মূল কারণ।

আমাদের দেশে প্রাচীন আমলে ধনুকাকৃতির হার্প সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিলো। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে সপ্ততন্ত্রী বীণা। এই যন্ত্রে সাতটি তার থাকতো। প্রাচীন ভাস্কর্যে এই যন্ত্রের যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

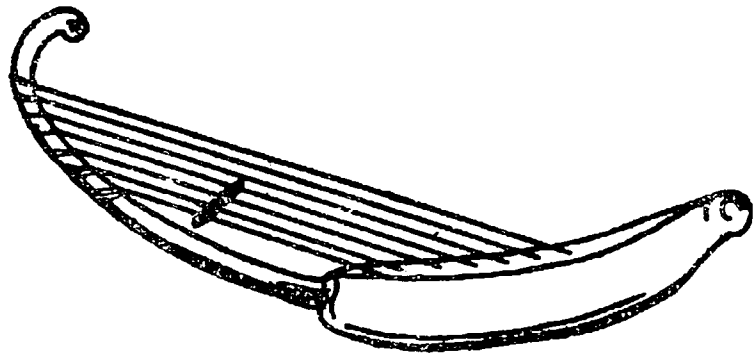

চিত্র-২২ ঃ ভাস্কর্যে প্রাপ্ত সপ্ততন্ত্রী বীণার নমুনা)

প্রাচীন ভাস্কর্যে প্রাপ্ত সপ্ততন্ত্রী বীণার চিত্র লক্ষ্য করলে বোঝা যায় খুব সাধারণ কৌশলে এটি নির্মিত হয়েছে। এর নিচের দিকের মোটা অংশটি হচ্ছে শব্দ প্রকোষ্ঠ, সাধারণত ফাঁপা গাছের ডাল থেকে তৈরি। এরই এক প্রান্ত থেকে বাঁকানো একটি দণ্ড যুক্ত হয়ে ধনুকের আকৃতি সৃষ্টি করেছে। সংজ্ঞা অনুযায়ী তারগুলো শব্দ প্রকোষ্ঠের সাথে লম্বভাবে যুক্ত। প্রাচীন আমলের এই তারগুলো তৈরি হতো পশুর নাড়ী বা অন্ত্র থেকে। এগুলোর একটি প্রান্ত শব্দ প্রকোষ্ঠ বা অনুনাদকের সাথে যুক্ত , অপর প্রান্ত বাঁধা হতো একটি চামড়ার পটির সাথে। সেই পটিটা আবার ঘুরিয়ে নিয়ে এসে দন্ডটির সঙ্গে বাঁধা হতো। লক্ষণীয় যে, যন্ত্রটিতে কোন খুঁটি বা বয়লা নাই। দন্ড বরাবর এই চামড়ার বন্ধন একটু উপরে বা নিচে করে তারের স্বরমাত্রার ওঠানামা পরিবর্তন করা হতো। অবশ্যই এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা হতো। [১৭]

প্রাচীন সপ্ততন্ত্রী বীণা থেকে তুলনামূলকভাবে আধুনিক যুগের বাদ্যযন্ত্র যেমন সেতার ও সুরবাহারের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করে থাকেন। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তনের ধারায় বিকশিত বিভিন্ন গোত্রের (হার্প, লিউট, জিথার, লিউট) বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব এবং প্রাচীন নিদর্শন থেকে এসব বাদ্যযন্ত্রের চিত্র বিশ্লেষণ করলে এ ধরণের ধারণা পোষন করার কোন অবকাশ নাই। সপ্ততন্ত্রী বীণা ছিলো ধনুকাকৃতির হার্প। সেতার হচ্ছে লম্বা গলার লিউট। আধুনিক যুগে সেতারে মূল তারের সংখ্যা হচ্ছে সাতটি। এই সংখ্যাভিত্তিক মিল ছাড়া আর কোন মিল নাই সপ্ততন্ত্রীর সাথে। দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের যন্ত্র। বরং সপ্ততন্ত্রীর উন্নত সংস্করণ 'সাউং গাউক' নামক এক ধরণের ধনুকাকৃতির হার্প বর্তমান যুগে মিয়ানমারে প্রচলিত রয়েছে। আকার ও আকৃতিতে এর বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে সপ্ততন্ত্রীর সাথে। মিয়ানমারের

Dhaka University Institutional Repository

অধিবাসীরা তাদের এই ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নিয়ে খুব গর্বিত, কারণ তারা মনে করে এই বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে তারা প্রাচীন ইতিহাসের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে। [১৮]

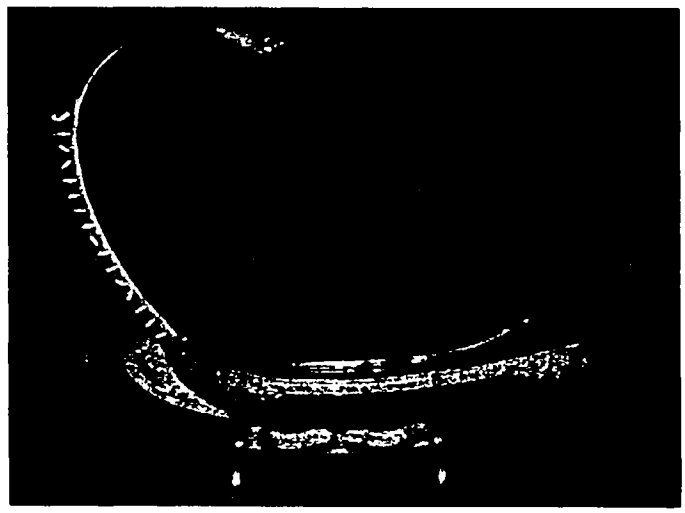

চিত্র-২৩ ঃ সপ্ততন্ত্রী বীণার মৌলিক কাঠামো বজায় রেখে আধুনিক যুগের ধনুকাকৃতির হার্প যা এখনো মিয়ানমারে প্রচলিত

সেতার ও সুরবাহারের মত লিউট যন্ত্রের উৎস বাস্তবসম্মত কারণেই হার্প হতে পারে না। বরং লিউট জাতীয় অন্য কোন প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রে এদের উৎস অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

উপমহাদেশের বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাসে প্রথম যুগ ছিলো হার্প জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের। পরবর্তী যুগ হচ্ছে জিথার জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের এবং সবশেষ অর্থাৎ আধুনিক যুগ হচ্ছে লিউট জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের। প্রাচীন আমলে হার্প জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের বহুল ব্যবহারের প্রমাণ বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আনন্দ কুমারস্বামী লিখেছেন "ভরত বর্ণিত বীণা বাদন কৌশল এবং সমসাময়িক মন্দির চিত্র থেকে এটুকু ধারণা করা যায় যে, সে আমলে প্রচলিত প্রায় সব বীণাই ছিলো হার্প গোত্রের।" [১৯]

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংশাবশেষে যে সকল সিল মোহর পাওয়া গেছে তার মধ্যে কোন কোনটায় প্রাচীন হার্প জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের ছবি উদ্ধার করা গেছে। এগুলো ধনুকাকৃতির হার্প। এ ধরণের একটি শিলালিপির চিত্র নিচে দেওয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

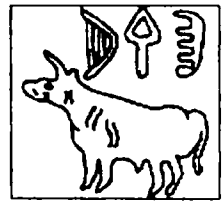

চিত্র-২৪ ঃ সিন্ধু-সিলসোহর

প্রাচীন হার্প জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সপ্ততন্ত্রী বীণার জনপ্রিয়তা ছিলো সবচেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো –

"খ্রীষ্টপূর্ব ১ম থেকে ৭ম শতকে ভারতবর্ষীয় সামজে সপ্ততন্ত্রীবীণার যে যথেষ্ট প্রচলন ছিলো তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। পিতলখোরার গুহায় (অজন্তার পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ইলোরার তেইশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বৌদ্ধস্তুপের ধ্বংশাবশেষ) যে তিনটি সাত তার যুক্ত সপ্ততন্ত্রী বীণা পাওয়া গেছে এম.এন.দেশপাণ্ডে Ancient India (Bulletin of the Archeological Suevey of India) no.15, 1959 সংখ্যায় "The Rock-cut Caves of Pitalkhora in the Deccan প্রবন্ধে E.Musicians (পৃঃ ৮৪) পর্যায়ে এর একটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন "The instrument, held by a youth against his right shoulder, has seven strings emanating from an elliptical gourd with a curved handle at one end, to which are tied the strings"। যন্ত্রগুলোর আকার মিশরীয় হার্পের মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে শুধু সপ্ততন্ত্রী কেন, সকল রকম বীণার আকারই ছিলো হার্পের মত। পিতলখোরা গুহামন্দিরের তিনটি সপ্ততন্ত্রী বীণার আকৃতিও তাই। বারহুত (খ্রীস্টপূর্ব ২য় শতক), অমরাবতী (খ্রীস্টীয় ২য়-৩য় শতক), গান্ধার (খ্রীস্টীয় ৮ম শতক), বরবুদুর (খ্রীস্টীয় ৮ম শতক), কিজিল (খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক) প্রভৃতিতে যে বীণার নিদর্শন পাওয়া যায় তাদের আকৃতিও হার্পের মত। এমন কি মুদ্রায় বাদনরত সমুদ্রগুপ্তের প্রতিকৃতিযুক্ত যে বীণার নিদর্শন পাওয়া যায় তার আকারও হার্পের মত।" [২০]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২৫ এবং চিত্র-২৬ ঃ সমুদ্র গুপ্তর মুদ্রা

এছাড়া অমরাবতী, সাঁচী প্রভৃতি গিরিগুহার চিত্রকলায় যে সকল বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় সে সম্পর্কে চীনা পরিব্রাজক হউয়েন চোয়াং মন্তব্য করেছেন – সাঁচী স্তুপের ভাস্কর্যে এক রকম হার্প জাতীয় বীণা দেখা যায় যা রোম দেশের টিবে (Tibae) এর সঙ্গে মেলে। অমরাবতীর ভাস্কর্যে আঠার জন নারীসহ বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন দেখা যায়। এই বাদ্যযন্ত্রগুলো এসিরীয় হার্পের মত দেখতে।[২১] এছাড়া ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন – অমরাবতীর ভাস্কর্যে যে হার্প দেখা যায় সেটি দেখতে অনেকটা অর্ফিউসের হার্পের মত। এক নারী উপবিষ্ট হয়ে বীণাযন্ত্র কোলে রেখে দু'হাতে বাজচ্ছে।[২২]

আম্বালার অদূরে রুপার নামক স্থানে খ্রীস্টপূর্ব ৬০০-৫০০ বছরের প্রাচীন ধ্বংশস্তুপে অন্যান্য নিদর্শনের সাথে বীণা বাদনরত একটি নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। নারীর হাতে চার তারবিশিষ্ট হার্প আকৃতির একটি বীণা। এই মূর্তির হার্পের সাথে সমুদ্র গুপ্তর হার্পের অসাধারণ সাদৃশ্য পাওয়া যায়।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২৭ ঃ প্রাচীন ভাস্কর্যে ধনুকাকৃতির হার্প, রুপারের খননকার্য থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন

বৈদিক যুগেও হার্প জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রচলণ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। টীকাকার কল্লিনাথের রচনায় 'মত্তকোকিলা বীণা' নামক একটি যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেটি বর্তমান কালের সুরমণ্ডলের অনুরূপ। আরেকটি যন্ত্র হচ্ছে সন্তুর। মধ্যযুগে কানুন নামে একটি যন্ত্রের প্রচলন ছিলো যা প্রকারান্তরে সন্তুরের একটি রূপ। সন্তুর বাদ্যযন্ত্রটির মূল 'বৈদিক বাণবীণা'য় নিহিত রয়েছে। বাণ ছিলো শত তারের বীণা। এর তারগুলো শন অথবা মুঞ্জ ঘাস দিয়ে তৈরি হতো এবং সম্ভবত কাঠি দিয়ে বাজানো হতো। পরবর্তীকালে এর নাম হয় শততন্ত্রী বীণা – অর্থাৎ যে বীণায় একশ তার আছে। বাদ্যযন্ত্রটির দণ্ডে দশটি ছিদ্র এবং প্রতিটি ছিদ্রে দশটি তার বাঁধা হতো। অর্থাৎ মোট একশটি তার থাকতো। [২৪]

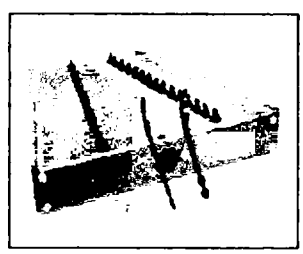

চিত্র-২৮ ঃ সন্তুর

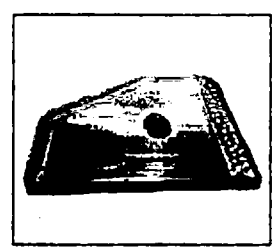

চিত্র-২৯ ঃ সুরমণ্ডল

Dhaka University Institutional Repository

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রায় দশম শতক অর্থাৎ তিন হাজার বছর রাজত্ব করার পর পলিকর্ড উপমহাদেশীয় সংগীত থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায় – শুধু থাকে সন্তুর ও সুরমণ্ডল। মনোকর্ড জাতীয় যন্ত্র অর্থাৎ লিউট এবং জিথার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র পরবর্তীতে প্রাধান্য বিস্তার করে। একটা পুরো সংগীত পদ্ধতি এভাবে পেছনে রয়ে গেল, হার্প ভিত্তিক সংগীত হলো পরিত্যক্ত এবং 'ফিংগারবোর্ড' বীণাকে অবলম্বন করে যে পদ্ধতি গড়ে উঠলো তা পুরাতন সংগীতের স্থান অধিকার করলো। এই প্রায়-বিপ্লব পরিস্থিতি আমাদের সংগীত ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন বলা যায়।[২৫] লিউট এবং জিথার জাতীয় যন্ত্রে একটি তারকে বিভিন্ন পর্দার উপরে অথবা যেখানে পর্দা নাই সেখানে সরাসরি ফিংগারবোর্ডের উপরে তার চেপে অর্থাৎ তারকে থামিয়ে উঁচু এবং নিচু স্বর অর্থাৎ সপ্তকের সব কটি সুর উৎপন্ন করা যায়। ফলে এর চমৎকারিত্বে আকৃষ্ট হয়ে শিল্পী এবং গবেষকগণ এই ধরণের আরো বাদ্যযন্ত্র আবিস্কারের নেশায় মেতে ওঠেন, এ ধারণা সহজেই করে নেওয়া যায়। কালক্রমে জিথারের তুলনায় লিউট জাতীয় যন্ত্র প্রাধান্য বিস্তার করে। এসব লিউটের কোনটা তারে আঙুলের টোকা দিয়ে অথবা প্লেকট্রাম দিয়ে আঘাত করে এবং কোনটা আবার ছড়ের সাহায্যে বাজানোর রীতি প্রচলিত হয়। এভাবে লিউট গোত্রীয় বিভিন্ন যন্ত্রের প্রায় ছড়াছড়ি হয়ে যায়। ফলশ্রুতি হলো নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র, যেমন, তম্বুর, রবাব, সুরবাহার, সুরশৃঙ্গার, সেতার,সরোদ, তাউস,দিলরুবা, এস্রাজ ইত্যাদি। এই বাদ্যযন্ত্রগুলো তুলনামূলকভাবে আধুনিক। কালের বিবর্তনে এইসব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কোন কোনটার প্রচলন কমে আসে। কোন কোটার আবার রূপান্তর ঘটে। নানা রূপান্তর এবং আধুনিকায়নের পর এ ধরণের যে ক'টি বাদ্যযন্ত্র জনপ্রিয়তার সাথে এদেশে টিকে আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – সেতার, সরোদ এবং এস্রাজ।

(খ) বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তনের কালানুক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা

ভৌগোলিক পরিসরের বিবেচনায় আমাদের দেশ যেখানে অবস্থিত তা এক সময়ে অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশ হিসেবে পরিগণিত ছিলো। সমগ্র অঞ্চলের সংগীত এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতের কিছু স্থান ব্যতীত ভারতীয় উপমহাদেশের সমগ্র এলাকার উচ্চাঙ্গ সংগীত এক এবং অভিন্ন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই ধারা হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগীত নামে পরিচিত। সুরের সন্ধানে সুরসম্রাট আলাউদ্দিন খাঁর ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগনর থানার শিবপুর গ্রামের গৃহত্যাগ করে সুদূর কোলকাতা, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন রাজ্যে গমন করে সংগীত শিক্ষা গ্রহনের ইতিহাস থেকেও আমরা সংগীতের এই অভিন্নতার প্রমাণ পাই। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন তাঁর অগ্রজ ফকির

Dhaka University Institutional Repository

(তাপস) আফতাবউদ্দিন খাঁর কাছে। তাঁর কাছে স্বর সাধনা এবং তালযন্ত্রের প্রাথমিক পাঠ নিয়ে তিনি এই সংগীতে পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভের অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন। অগ্রজর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ধারাবাহিকতায় তিনি এরপর একের পর এক ওস্তাদের কাছে তালিম গ্রহণ করেন। প্রথমে কোলকাতায় একাধিক ওস্তাদের কাছে কণ্ঠ এবং বিভিন্ন যন্ত্রে তালিম গ্রহণ করেন। পরে ছুটে যান উত্তরপ্রদেশের রামপুরে। সেখানে মিঞা তানসেনের বংশধর ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিন কর্মজীবন অতিবাহিত করেন মাইহার রাজ্যে। একই গুরু ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর অনুজ ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং কুমিল্লায় সংগীত শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। দুইজন দুই জায়গায় অবস্থান করলেও পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁরা উপমহাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নবরূপ দান করেছেন এবং নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র আবিস্কার করেছেন। তাঁদের এই গবেষণার কথা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। বর্তমান অধ্যায়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অভিন্ন রূপ প্রসঙ্গে তাঁদের কথা যৎসামান্য আলোচনা করা হলো।

প্রকৃতপক্ষে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অভিন্ন রূপ নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নাই। একই ধরণের বাদ্যযন্ত্র সমগ্র অঞ্চলে প্রচলিত যাতে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করা হয়। আঞ্চলিকভাবে কিছু লোক বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি প্রভাবিত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশেও লোকসংগীতের জগতে প্রচলিত রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু যে সকল বাদ্যযন্ত্রে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশিত হয় তা একইভাবে সমগ্র এলাকায় প্রচলিত। কাজেই উৎস সন্ধান করতে হলে অভিন্ন ইতিহাস বিশ্লেষণই একমাত্র উপায়।

বাদ্যযন্ত্রের কালানুক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস ঃ

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে সব ধরণের তারের যন্ত্র বীণা নামে পরিচিত ছিলো। মনোকর্ড অথবা পলিকর্ড, ছড় দিয়ে বাজানোর যন্ত্র অথবা টোকা দিয়ে বাজানোর যন্ত্র, পর্দাযুক্ত অথবা পর্দাবিহীন যন্ত্র সবই এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এর মধ্যে কোনটা ছিলো জিথার দলভুক্ত, কোনটা লিউট দলভুক্ত। ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার বীণার নাম পাওয়া যায়। তবে কোনটি কোন ধরণের হতে পারে তা বলা হয় নি। তেমনি 'সংগীত মকরন্দ' গ্রন্থে উনিশটি, 'সংগীতপনিষতসারদ্ধার' গ্রন্থে তেরটি এবং 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থে দশটি বীণার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আকার ভেদে কোনটি কোন দলভুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে বিশদ বিবরণ নাই। গঠন নির্বিশেষ সবগুলোই বীণা। পরবর্তীকালে নাট্যশাস্ত্রের

Dhaka University Institutional Repository

টীকাকার কল্লিনাথ নাট্যশাস্ত্রে বর্নিত বীণাগুলোর ব্যাখ্যা দান করেছেন। 'চিত্রা' এবং 'বিপঞ্চী' হার্পের মত পলিকর্ড জাতীয় বীণা। 'রুদ্রবীণা' এবং 'স্বরস্বতী বীণা' মনোকর্ড জাতীয়। আবার 'রাবন হস্ত বীণা' এবং 'পিনাকী বীণা' হচ্ছে ছড় দিয়ে বাজানো হয় এমন ধরণের যন্ত্র। বেহালার সাথে এগুলোর তুলনা করা যেতে পারে। আধুনিক যুগে আমরা এগুলোকে বীণা বলে ভাবতে পারি না। আবার 'নাগস্বরম' বা 'শানাই'এর মত শুষির বাদ্যযন্ত্র পরিচিত 'মুখবীণা' হিসেবে। আজও 'বীণ' বলতে 'রুদ্রবীণা' এবং সাপুড়ের বাঁশি দু'টোকেই বোঝানো হয়। [২৬] বিষয়টি বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তন উদঘাটনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এ কারণে বি.সি. দেব তাঁর 'ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র' গ্রন্থে লিখেছেন "প্রাচীন পুস্তকে এই শব্দটি (অর্থাৎ বীণা) পেয়ে যদি কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করেন যে, আধুনিক বীণার ঐতিহ্য (আধুনিক বলতে এখানে রুদ্রবীণা অথবা তাঞ্জৌরী বীণার মত তুলনামূলক আধুনিক যুগের বাদ্যযন্ত্রের কথা বোঝানো হয়েছে) অতি পুরাতন, তিনি হয়তো ভুল করবেন। কারণ, এই পুরাতন শব্দটি সম্ভবত হার্প জাতীয় অন্য কিছু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।" [২৭]

এই কারণে অত্যন্ত সতর্কভাবে বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করা দরকার। প্রাচীন নিদর্শন এবং ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে বাদ্যযন্ত্রগুলোর বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে এদের গঠনগত পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা তাই খুব জরুরী।

মধ্যযুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগীত বিষয়ক রচনা হচ্ছে শার্ঙ্গদেব রচিত 'সংগীতরত্নাকর'। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এটি রচিত হয়। এই গ্রন্থে শার্ঙ্গদেব প্রাথমিক যুগের একটি বীণাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করছেন, এর নাম 'একতন্ত্রী বীণা'। শার্ঙ্গদেবের মতে এটি তখনকার সময়ে বীণা জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে প্রধান হিসেবে পরিগণিত হতো। [২৮] এটি উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, এটিই প্রথম এক তার বিশিষ্ট ফিংগারবোর্ড যন্ত্র যাতে সুর বাজানো যায়। মনোকর্ড যন্ত্র হিসেবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার। কারণ এর পূর্ববর্তী যন্ত্রগুলো ছিলো পলিকর্ড জাতীয়। একাধিক তারকে বিভিন্ন সুরে বেঁধে নিয়ে এসব পলিকর্ড জাতীয় বীণা বাজানো হতো। এইসব যন্ত্রে এক একটি সুরের জন্য এক একটি তার ব্যবহৃত হতো। আলাদাভাবে বিভিন্ন তারে টোকা দিয়ে এইনব বীণা বাজনো হতো। বাঁ হাতের আঙুলের সাহায্যে ফিংগারবোর্ডে তার চেপে কার্যত এর দৈর্ঘ্য কম বেশি করে বিভিন্ন সুর উৎপন্ন করার ব্যবস্থা এসব বীণায় ছিলো না। এ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে আধুনিক। তারের যন্ত্রে পর্দা (ফ্রেট) ব্যবহার করে অথবা

Dhaka University Institutional Repository

অথবা পর্দাবিহীন যন্ত্রে ফিংগারবোর্ডের উপরে আঙুল চেপে কার্যত তারের দৈর্ঘ্য কমানো অথবা বাড়ানো হয়। ইংরেজিতে একে বলে Active vibration length। এক পর্দা থেকে আরেক পর্দায় আঙুল সরিয়ে নিলে Active vibration length পরিবর্তিত হয়। খাদের সুর বাজাতে হলে Active vibration length দীর্ঘ হওয়া দরকার। আবার চড়া সুর বাজাতে হলে Active vibration length খাটো হওয়া দরকার। এই প্রয়োজন অনুসারে ফিংগাবোর্ডে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে হয়।

ভরত বর্ণিত ঘোষ বীণা অথবা ঘোষিকা বীণার পরিমার্জিত রূপ ছিলো একতন্ত্রী বীণা। এটি ছিলো জিথার গোত্রের বাদ্যযন্ত্র। ডান হাতের আঙুল দিয়ে তারে আঘাত করে একতন্ত্রী বীণা বাজানো হতো। বাঁ হাতের তিনটি আঙুল- তর্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকার সাহায্যে ফিংগারবোর্ডে তার চেপে যন্ত্রটি বাজানো হতো। তবে বাজানোর সময়ে বাঁ হাতের আঙুলে পাতলা এক খণ্ড বাঁশের চটা বেঁধে নেওয়া হতো। বাঁ হাতের সাহায্যে তারের দৈর্ঘ্য কম বেশি করে যন্ত্রে সুর তোলার কারণে এটি একটি উৎকৃষ্ট যন্ত্র হিসেবে সমাদর লাভ করে হার্প জাতীয় অন্যান্য যন্ত্রের তুলনায়। পর্দাবিহীন হওয়ার কারণে দক্ষ শিল্পীরা এতে সূক্ষতম শ্রুতি পরিবেশন করতে পারতেন। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এর আমল থেকে শার্ঙ্গদেবের 'সংগীতরত্নাকর'-এর রচনাকাল পর্যন্ত এটি প্রায় হাজার বছর ধরে প্রচলিত ছিলো। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে এসে এটি অন্যতম প্রধাণ বীণা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতেও একতন্ত্রী বীণা সমান জনপ্রিয় ছিলো।[২৯]

ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে কিন্নরী বীণার উন্নততর সংস্করণ আবিস্কার হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে একতন্ত্রী বীণার জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। কিন্নরী বীণা ছিলো ফ্রেটযুক্ত জিথার। কিন্নরী বীণার কয়েকটি রূপ প্রচলিত ছিলো। এর কোনটি লোক বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এবং কোনটি উচ্চাঙ্গ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হতো। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের রচনায় যে ধরণের কিন্নরী বীণার উল্লেখ করা হয়েছে তাতে দু'টি তার এবং তিনটি লাউ ব্যবহার করা হতো।

আরো পরে কিন্নরী বীণার উন্নততর সংস্করণ হিসেবে রুদ্র বীণা এবং স্বরস্বতী বীণার আবির্ভাব হয়। কিন্নরী বীণায় চৌদ্দটি পর্দা থাকতো, এগুলো সরানো যেতো। রুদ্র বীণায় পর্দার সংখ্যা হলো বাইশটি। এগুলো বাঁশের গায়ে মোম দিয়ে আটকিয়ে দেওয়া হতো। দক্ষিণ ভারতে ক্রমান্বয়ে পর্দাযুক্ত বীণার নানা

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন এবং বিবর্তন সাধিত হতে থাকে যা পরবর্তীকালে স্বরস্বতী অথবা তাঞ্জৌরী বীনার রূপ লাভ করে। [৩০]

রুদ্র বীণা নামের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় নারদ রচিত 'সংগীত মকরন্দ' গ্রন্থে। কিন্নরী বীণার সাথে রুদ্র বীণার মূল পার্থক্য দু'টি। প্রথমটি হচ্ছে পর্দার সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে লাউয়ের সংখ্যা। কিন্নরী বীণার তুলনায় রুদ্র বীণায় পর্দার সংখ্যা আটটি বেশি এবং এগুলোর বিণ্যাসেও পার্থক্য বিদ্যমান। রুদ্রবীণায় বারোটি স্বরের প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক পর্দা থাকে। এই কারণে পর্দা না সরিয়েও এই যন্ত্রে যে কোন রাগ পরিবেশন করা যায়। এছাড়া কিন্নরী বীণায় তিনটি লাউ ব্যবহৃত হতো। রুদ্রবীণায় লাউয়ের তুম্বা রইলো দু'টি। ক্রমে রুদ্র বীণা উপমহাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বীণায় পরিণত হয় এবং সংক্ষেপে শুধু 'বীণ' নামে পরিচিত হয়। এর জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বীণা বলতে আধুনিক যুগে শুধু রুদ্র বীণাকেই বোঝায়।

রুদ্র বীণার দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে তিন ফুট। এর দৈর্ঘ্য বলতে প্রকৃতপক্ষে এর ফিংগারবোর্ডের দৈর্ঘ্যকেই বোঝায়। এটি বাঁশের তৈরি। এর পেছন দিকে দু'টি লাউয়ের তুম্বা সংযুক্ত থাকে। লাউয়ের ব্যাস সাধারণত চৌদ্দ ইঞ্চি। তবে বাঁশ খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রতি বছর পরিবর্তন করতে হয় বলে আধুনিক যুগে বাঁশের পরিবর্তে সেগুন কাঠের ফিংগারবোর্ড ব্যবহৃত হয়।

রুদ্রবীণার পর্দাগুলো কাঠের তৈরি। বিশেষভাবে তৈরি এক ধরণের মোম দিয়ে এগুলো ফিংগারবোর্ডের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি পর্দার উপরে পিতলের পাতলা পাত লাগানো হয়। বাদকের ইচ্ছা অনুযায়ী পর্দার সংখ্যা কম অথবা বেশি হতে পারে।

রুদ্র বীণায় তার থাকে সাতটি। চারটি মূল তার। বাকী তিনটি শ্রুতি তন্ত্রী অর্থাৎ ড্রোন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে দু'টি লাগানো হয় বীণার ডান পাশে এবং একটি লাগানো হয় বাম পাশে। [৩১]

এতক্ষণ যে সকল বাদ্যযন্ত্রের কথা বলা হলো সেগুলো সব জিথার গোত্রের। এগুলো ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে লিউট জাতীয় যন্ত্রেরও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দী সময়ের মধ্যে অজন্তা, নাগার্জুনকণ্ডা এবং অমরাবতীর গুহাচিত্রে অঙ্কিত ভাস্কর্য এবং দেয়ালচিত্রে স্পষ্টভাবে লিউট জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের চিত্র পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনব গুপ্ত সকল বাদ্যযন্ত্রকে তিনটি গোত্রে বিভক্ত করেছিলেন – (১) বক্র, (২) কুর্মি এবং (৩) অলাবু। কুর্মি অর্থ কচ্ছপ, সুতরাং যে সব যন্ত্রের দেহ গোলাকার এবং চেপ্টা, নাতিদীর্ঘ ফিংগারবোর্ড বিশিষ্ট সেই সকল যন্ত্রকে তিনি দ্বিতীয় গোত্রভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। অজন্তা, নাগার্জুনকণ্ডা এবং অমরাবতীর চিত্রগুলোতে যে ধরণের লিউটের ছবি পাওয় যায় তা হুবহু অভিনব গুপ্তর বর্ণনার সাথে মিলে যায়। খিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্য প্রদেশের একটি বৃন্দ বাদনের চিত্রে দেখা যায় একজন মহিলা বাদক কোলে একটি লিউট ধরণের যন্ত্র নিয়ে বাজাচ্ছে। ছবিটি এত স্পষ্ট যে, এতে অঙ্কিত তারের সংখ্যাও গুনে দেখা যায় যে যন্ত্রটিতে সাতটি তার রয়েছে। চিত্রে বাদক তার ডান হাত দিয়ে যন্ত্রের তারে টোকা দিচ্ছে এবং বাঁ হাত দিয়ে তার চেপে ধরেছে। যন্ত্রটির ফিংগারবোর্ডে কোন পর্দা নাই। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছিলেন যে চিত্রা বীণা সাত তার বিশিষ্ট। সম্ভবত সেই কথার উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক লাল মণি মিশ্র এবং ড.বি.সি.দেব এই যন্ত্রটিকে চিত্রা বীণা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। [৩২]

ঐতিহাসিক নিদর্শনে এইসব বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার কারণে বাস্তবে এ ধরণের যন্ত্রের উপস্থিতি সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া যায়। যদিও তদানীন্তন সংগীতের ইতিহাসে দণ্ডাকৃতি জিথারের তুলনায় এগুলোর উপস্থিতি খুবই নগন্য। সংগীতের ইতিহাসে দীর্ঘদিন এ ধরণের যন্ত্রের বহুল ব্যবহার চোখে না পড়লেও এই ধরণের যন্ত্র থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সংগীতের ইতিহাসে উদ্ভব হয়েছে রবাব নামক যন্ত্রের। সংগীতের ইতিহাসে এটি একটি প্রধান বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিগণিত। সম্রাট আকবরের আমলে যন্ত্রটি উৎকর্ষ লাভ করে। তাঁর দরবারের সভা সংগীতজ্ঞ মিঞা তানসেন অসাধারণ রবাব বাজাতে পারতেন। রবাবের একাধিক সংস্করণ রয়েছে। মিঞা তানসেন যে ধরণের রবাব বাজাতেন সেটি তাঁর নামের অনুসরণে সেনিয়া রবাব নামে পরিচিত। এর অপর নাম ধ্রুপদী রবাব। চিত্রা বীণার কোন একটি সংস্করণ থেকে পরিমার্জনের মাধ্যমে মিঞা তানসেন একে ধ্রুপদী সংগীতের উপযোগী করে তোলেন বলে অধ্যাপক লাল মণি মিশ্র দৃঢ়ভাবে মতামত ব্যক্ত করছেন। [৩৩]

ধ্রুপদী রবাবের দৈর্ঘ্য তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট হয়ে থাকে। সেগুন অথবা মেহগনি কাঠের বড় আকারের একটি টুকরা কেটে যন্ত্রটি তৈরি করা হয়। শব্দ প্রকোষ্ঠ প্রায় গোলাকার করে কেটে তৈরি করা হয়। এর

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাস বারো ইঞ্চি। কাঠ খুদে ফাঁপা করে নিয়ে তার উপরে ছাগলের ছামড়ার ছাউনি দেওয়া হয়। এর পরের অংশ ফিংগারবোর্ড। এটি ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে গেছে। এর ভেতরাট খুদে ফাঁপা করা হয় এবং কাঠের একটি পাতলা ফিংগারবোর্ড লাগানো হয়। ফিংগারবোর্ডে কোন পর্দা থাকে না। ফিংগারবোর্ডের শেষ অংশে ছয়টি খুঁটির সাহায্যে ছয়টি তার লাগানো থাকে। তারগুলো ছাউনির উপরে লাগানো একটি ব্রিজের উপর দিয়ে ফিংগারবোর্ড অতিক্রম করে শেষ প্রান্তে চলে যায়। এই যন্ত্রের ব্রিজটি প্রকৃত অর্থে জওয়ারি। অর্থাৎ উপমহাদেশীয় যন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ব্রিজে বিদ্যমান। জওয়ারি বলতে প্রশস্ত চেপ্টা আকারের ব্রিজ বোঝায়। এর উপর দিয়ে যখন তার অতিক্রম করে তখন এর প্রশস্ত উপরিতলে ঘর্ষনের ফলে গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়। এই বৈশিষ্ট্য উপমহাদেশের বাইরের কোন বাদ্যযন্ত্রে সচরাচর দেখা যায় না।

ধ্রুপদী রবাব ছাড়াও আরো কয়েক প্রকার রবাবের প্রচলন ছিলো উপমহাদেশে। সরোদের উদ্ভব ও বিবর্তন প্রসঙ্গে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে রবাব অত্যন্ত জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিলো। এই সময়ে প্রাপ্ত মিনিয়েচার চিত্রকর্মগুলোতে রবাবের ব্যাপক উপস্থিতি সে কথাই প্রমাণ করে।

আকবরের শাসনামলে রুদ্র বীণা এবং সেনিয়া রবাব – এই দু'টি যন্ত্র গুণে ও মানে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। মিঞা তানসেনের কন্যা ও পুত্রবংশীয় সংগীত সাধকগন যথাক্রমে এই দু'টি যন্ত্রের চর্চা বংশানুক্রমিকভাবে অব্যাহত রাখেন। এঁদের পরিচিতি ছিলো বীণকার এবং রবাবিয়া নামে। তিনশত বছর ধরে অন্য কোন যন্ত্র এই উপমহাদেশে প্রাধাণ্য লাভ করতে পারে নি। তবে কণ্ঠসংগীতের অনুগামী যন্ত্র হিসেবে এ সময়ে সারেঙ্গি প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। সারেঙ্গীর পরবর্তী সময়ে তাউস এবং আরো পরে দিলরুবা ও এস্রাজ নামক দু'টি যন্ত্রের উদ্ভব হয়। ছড় দিয়ে বাজানোর এইসব যন্ত্রের মধ্যে বাংলাদেশে এস্রাজ সবচেয়ে জনপ্রিয়।

১৯শ শতকের শুরুতে সুরবাহার এবং সুরশৃঙ্গার যন্ত্র দু'টির উদ্ভব হয়। এর পরেই উদ্ভব হয় সেতার এবং সরোদ যন্ত্র দু'টির, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। সেতার এবং সরোদ যন্ত্র দু'টির বিকাশের সাথে সাথে

Dhaka University Institutional Repository

বীণা এবং রবাবের প্রচলন কমতে থাকে। আরো পরে সেতার এবং সরোদ যন্ত্রটির অধিক পরিমার্জনা এবং আধুনিকায়নের ফলে আগের যন্ত্র দু'টি ম্রিয়মান হয়ে পড়ে।

বিংশ শতাব্দীতে বেহালা যন্ত্রের আবির্ভাব হয় উপমহাদেশে। পাশ্চত্যে প্রচলিত এই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ দেশীয় বাদনরীতিতে অর্থাৎ হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশনে ব্যবহৃত হয়। এই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। বেহালা পশ্চিমা দেশ থেকে আমাদের দেশে এলেও ছড় দিয়ে বাজানোর যন্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থল এই উপমহাদেশের মাটিতেই, এ বিষয়ে আজ সবাই একমত।

তারের যন্ত্রের মধ্যে সব যন্ত্রই সুর বাজানোর কাজে ব্যবহৃত হয় না, শুধু সুর ধরে রাখার জন্যও কিছু যন্ত্র রয়েছে। যেমন, একতারা, গোপীযন্ত্র, লাউ এবং তানপুরা। এগুলোকে শ্রুতি বীণা বলা হয়। সুর বাজানোর যন্ত্রগুলো অর্থাৎ যেগুলোতে রাগ সংগীত পরিবেশন করা হয় সেগুলোকে বলা হয় স্বর বীণা। যেমন, সেতার, সরোদ, এস্রাজ ইত্যাদি। [৩৪]

স্বর বীণা গোত্রের বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে বিবর্তনের ধারায় অবশেষে সেতার, সরোদ এবং এস্রাজ এই তিনটি যন্ত্র আমাদের দেশে জনপ্রিয়তার নিরিখে প্রধাণ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে টিকে আছে। পরবর্তী অংশে এই তিনটি যন্ত্রের বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করা হবে।

প্রচলিত তত যন্ত্র সেতার ঃ-

বর্তমান যুগে আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে আলোচিত বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে সেতার। সেতার বাজানোর মূল কৌশলগুলো বীণার অনরূপ। তবে বীণার সাথে এর গঠনগত পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া আকার ও আয়তনের দিক থেকে সেতার অনেক সুবিধাজনক এবং সহজে বহনযোগ্য। সেতারের বর্তমান রূপলাভের পেছনে রয়েছে বিবর্তনের এক দীর্ঘ ইতিহাস।

সেতারের আবির্ভাব বিষয়ে চারটি অনুমানের কথা উল্লেখ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অনুমান হচ্ছে, প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের কোন এক প্রকার বীণা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের মাধ্যমে বর্তমান সেতারে পরিণত হয়েছে। এই অনুমান যারা সমর্থন করেন তাদের মধ্যে ত্রিতন্ত্রী বীণার সাথে সেতারকে সম্পর্কযুক্ত করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

দ্বিতীয় অনুমান হচ্ছে, খ্রিস্টীয় নবম এবং দশম শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরে খচিত ভাস্কর্যে লম্বা গলার লিউট জাতীয় বীণার চিত্র দেখা যায়। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে সেতার জাতীয় যন্ত্রের প্রচলন ছিলো। এ প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট করে কোন বীণার নাম উল্লেখ করা যায় না, তবে ঐ সকল ভাস্কর্যে যে লম্বা গলার লিউটের ছবি পাওয়া গেছে তার সাথে সেতারের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি গবেষকদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তৃতীয় অনুমান হচ্ছে, উপমহাদেশের বাইরে থেকে আগত কিছু বাদ্যযন্ত্র সেতার উদ্ভাবনকে প্রভাবিত করেছে। সেতারের আবিস্কারে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার প্রভাবের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন অখণ্ড ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম শাসকদের আগমন শুরু হয় খিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শুরু থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে। উত্তর পশ্চিম উপকূলের মাধ্যমে মূলত এসব বহিরাগত শাসসকদের আগমণ ঘটে, সেইসাথে সংগীত, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক রীতি নীতি সবকিছুতেই ধীরে ধীরে পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতির প্রভাব যুক্ত হতে থাকে। এ সময়ে তারের কয়েকটি মনোকর্ড জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের আগমন ঘটে এদেশে। এর মধ্যে পারস্যের 'সেহ্তার' এবং 'তম্বুর' এবং উজবেকিস্তারেন 'দুতার' যন্ত্রকে সেতারের পূর্বসূরী মনে করা হয়। এসব যন্ত্রের চিত্র দেখে সেতারের সাথে কোন কোন অংশে বেশ মিল পাওয়া যায়। যে কারণে এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। [৩৫]

চতুর্থ অনুমান হচ্ছে, শুধু প্রাচীন উপমহাদেশীয় কোন যন্ত্র নয়, কিংবা শুধু উপমহাদেশের বাইরের কোন যন্ত্রের প্রভাবে নয়, বরং উপমহাদেশীয় বাদ্যযন্ত্র এবং উপমহাদেশের বাইরে থেকে আগত বাদ্যযন্ত্রের মেলবন্ধনে সেতারের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে পারস্য 'সেহতার' বা 'তম্বুর'জাতীয় যন্ত্র এবং উপমহাদেশীয় 'বীণা' জাতীয় যন্ত্রের আদানপ্রদানজনিত বিবর্তনের বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। [৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি অনুমান পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

ত্রিতন্ত্রী বীণা এবং সেতার ঃ

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব রচিত 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থটিতে ত্রিতন্ত্রী বীণার উল্লেখ অনেক গবেষককে ত্রিতন্ত্রী বীণার সাথে সেতারকে সম্পর্কযুক্ত করতে উৎসাহিত করে। বৈদিক যুগের এই বাদ্যযন্ত্রের সাথে সেতারকে সম্পর্কযুক্ত করতে গিয়ে শৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর ১৮৭২ খিস্টাব্দে রচিত 'যন্ত্র ক্ষেত্র দিপীকা' গ্রন্থে দাবী করেছেন যে আমীর খসরু ত্রিতন্ত্রী বীণাকেই সেতার নামকরণ করেছেন। [৩৭] বিষয়টি সমগ্র ইতিহাসকে আরো ঘোলাটে করে তুলেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন সংগীত গবেষক ড.পিটার কুটচি। কারণ প্রাচীণ মন্দিরের চিত্রকলা অথবা মুগল চিত্রকলায় অনুসন্ধান করলে কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্রকর্মে আধুনিক সেতার জাতীয় কোন বাদ্যযন্ত্রের অবয়ব পরিলক্ষিত হয়। [৩৮] শৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুরের মত অধ্যাপক লালমণি মিশ্র তাঁর 'ভারতীয় সংগীত বাদ্য'গ্রন্থে 'ত্রিতন্ত্রী' বীণা থেকে সেতারের উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন মাঝখানে 'যন্তর' নামে একটি বাদ্যযন্ত্রকে মাধ্যম হিসেবে রেখে। 'সংগীতরত্নাকর' এবং 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ দু'টির উপর ভিত্তি করে তাঁর যুক্তি হলো 'ত্রিতন্ত্রী' বীনা পরবর্তীকালে 'যন্তর' নামে পরিচিত হয় এরং 'যন্তর' হলো সেতারের আদি নাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব রচিত গ্রন্থে ত্রিতন্ত্রী বীণার নাম উল্লেখ আছে কিন্তু কোন বর্ণনা নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে টীকাকার কল্লিনাথ বলেন যে, 'ত্রিতন্ত্রী' বীণার জনপ্রিয় নাম হচ্ছে 'যন্তর'। সে সময়ে ত্রিতন্ত্রী বীণা সম্ভবত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিলো, অন্তত নামের দিক থেকে, কারণ কল্লিনাথের পরবর্তী সময়ে এই নামে কোন যন্ত্রের নাম পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীতে আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে 'যন্তর'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময়ে এটি সম্রাট আকবরের রাজদরবারে একটি প্রধাণ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হতো। আবুল ফজলের রচনা থেকে 'যন্তর' এবং 'বীণ'এর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হলো –

"যন্তর এক গজ দীর্ঘ ফাঁপা কাঠের গলা দিয়ে তৈরি। দু'প্রান্তে আধখানা লাউ সংযুক্ত। গলার উপরে ষোলটি পর্দা। এর উপর দিয়ে পাঁচটা তার গেছে। তারগুলি দু'দিকেই বাঁধা। পর্দার বিণ্যাসের দ্বারা তীব্র ও কোমল স্বর এবং তাদের বৈচিত্র সৃষ্টি করা হয়।"

"বীণা প্রায় যন্তরের অনুরূপ, কিন্তু তিনটি তারযুক্ত।" [৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আকবরের আমলের 'যন্তর' আর কল্লিনাথ উল্লিখিত 'যন্তর' হয়তো একই ছিলো, এমনকি শার্ঙ্গদেবের 'ত্রিতন্ত্রী'র সাথেও এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত 'যন্তর' ছিলো একটি দণ্ডাকৃতি জিথার, যা উত্তর ভারতে অত্যন্ত প্রচলিত ছিলো 'বীণা' নামে। অথচ সেতার একটি লিউট গোত্রের বাদ্যযন্ত্র। সেতারের সাথে জিথার গোত্রভুক্ত 'যন্তর'এর আকৃতিগত কোন মিল নাই। উপরন্তু যন্তর বীণার থেকেও পৃথক এ কারণে যে, এতে সংযুক্ত লাউ দু'টি অর্ধেক করে কাটা, বীণা বা জনপ্রিয় 'বীণ'-এর মত সম্পূর্ণ লাউ এই যন্ত্রের তুম্বা হিসেবে সংযুক্ত নয়।

পরবর্তীকালে বীণের জনপ্রিয়তা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র উত্তর ভারতে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়, পক্ষান্তরে 'যন্তর'এর ব্যবহার কমে আসে। শুধু রাজস্থানের লোক বাদ্যযন্ত্র হিসেবে 'যন্তর' এখনও টিকে আছে, সেটি আকারে একটি ছোট বীণের মত। ড.এলাইন মাইনার বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেছেন যে, কোথাও 'যন্তর'এর সাথে সেতার কিংবা 'ত্রিতন্ত্রী' বীণার কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় নি। [৪০]

ত্রিতন্ত্রী অর্থ তিন তার বিশিষ্ট যন্ত্র। অপরদিকে ফারসী ভাষায় সেতার অর্থও তাই (সেহ্ = তিন, তার = তন্ত্রী)। নামের অর্থগত মিল সম্ভবত গবেষকদের এই দু'টি যন্ত্রের সাথে সম্পর্ক আবিস্কারে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এছাড়া আকার আকৃতির দিক থেকে এবং শ্রেণীবিণ্যাসের ভিত্তিতে দু'টি যন্ত্রের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং ত্রিতন্ত্রী বীণা থেকে সেতার উদ্ভাবনের অনুকূলেও কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের লম্বা লিউট জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ঃ

দক্ষিণ ভারতের কিছু মন্দিরের গাত্রে অঙ্কিত রিলিফ চিত্রকর্মে লম্বা গলার লিউট জাতীয় কিছু বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেখা যায়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রাক মুসলিম যুগ থেকে ভারতে সেতার বা সেতার জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিলো।[৪১] নিদর্শনগুলো পাওয়া গেছে দশম শতাব্দীতে চালুক্য রাজবংশের আমলে পট্টদকল নামক স্থানে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে চিদাম্বরম নামক স্থানে। এগুলোর আকারে ভিন্নতা দেখা যায়, তবে ধারণা করে নেয়া যায় এর একটা মৌলিক ধরণের আকার ছিলো যা সে সময়ে প্রচলিত ছিলো। [৪২] সংগীতের ইতিহাসে এইসব বাদ্যযন্ত্রের অবস্থান নিয়ে অনেক গবেষণা হতে পারে এবং এইসব

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা থেকে অনেক অজানা তথ্য বের হয়ে আসতে পারে। এগুলোর আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য গবেষকদের কৌতুহলের বিষয়। অথচ বাস্তবে এই যন্ত্রগুলো বেশি আলোচিত হয় নি। ইতিহাসে এদের নির্দিষ্ট স্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি উপমহাদেশের কোথাও এমন কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না যা থেকে ঐ সমস্ত লম্বা গলা লিউটের নাম সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। দণ্ডাকৃতি জিথারের তুলনায় এগুলোর সংখ্যা খুবই নগন্য। এর অন্যতম কারণ হতে পারে দণ্ডাকৃতির জিথারের প্রবল জনপ্রিয়তা । উপমহাদেশের সংগীতের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত হার্প জাতীয় বীণার প্রচলন ছিলো। ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে হার্পের পরিবর্তে দণ্ডাকৃতির জিথার প্রাধাণ্য লাভ করে।

চিত্র-৩০ ঃ মধ্যযুগের দেয়াল চিত্রে লম্বা গলার লিউট

মন্দিরচিত্রে লম্বা গলার লিউট জাতীয় বাদ্যয়ন্ত্রের চিত্র এ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি নিশ্চিত করে। কিন্তু পাশাপাশি সংস্কৃত রচনাবলিতে এবং পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্য গবেষকদের রচনায় এর উল্লেখ নিতান্ত অপ্রতুল। শুধু একটি সম্ভাব্য সূত্র পাওয়া যেতে পারে দক্ষিণ ভারতে, যেখানে 'কচ্ছপী' নামে লম্বা গলার

Dhaka University Institutional Repository

কথা নাকচ করে দেওয়া যায় না। হয়তো জিথার জাতীয় যন্ত্রের প্রাধাণ্যের কারণে এগুলো তৎকালে জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। সংগীতের ইতিহাসে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে এইসব যন্ত্রের প্রচলন নিতান্ত গুরুত্বহীন একটি বিষয় ছিলো। এর প্রচলনও খুব অল্প জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিলো। যার ফলে মধ্যযুগের মন্দিরচিত্রে প্রাপ্ত লম্বা গলার লিউটের সাথে সেতারের কোন ধারাবাহিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।

মন্দিরে লম্বা গলার লিউটের চিত্র অঙ্কনের আগেও খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে খাটো গলার কিছু লিউট জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিলো। অধ্যাপক লালমণি মিশ্র এবং ড.বি.সি. দেব এগুলোকে চিত্রা বীণা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর সাতটি তার ছিলো এবং এগুলো ছিলো মনোকর্ড জাতীয় যন্ত্রের গোত্রভূক্ত। কিন্তু এর সাথেও সেতারের যোগসূত্র তথ্য প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা যায় নি।[৪৪] তবে উপমহাদেশের বাইরে থেকে যেমন অনেক বাদ্যযন্ত্র এসেছিলো, তেমনি উপমহাদেশের ভেতরে যেটি চিত্রা বীণা হেসেবে পরিচিত ছিলো সেটি বাইরে চলে গিয়ে অন্যান্য দেশে গৃহীত হওয়ার পক্ষে অনেক জোরালো যুক্তি পাওয়া যায়। চিত্রা নাম নিয়ে গবেষণা করার ফলে এ সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড.সুনিরা কাসলিওয়াল একটি ধ্বণিতত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় তা এখানে উল্লেখ করা হলো। দিল্লী ইউনিভার্সিটির ফার্সি বিভাগে ১৯৮২ সালে বিশেষ অতিথি বক্তা হিসেবে করাচী থেকে আগত অধ্যাপক মমতাজ হুসেন 'Sitar Shabda Ki Dastan' নামক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছিলেন, সেই গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে ড.সুনিরা কাসলিওয়াল এই বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন গ্রিকদের সিথারা, হিব্রুদের কিথারা, উত্তর আফ্রিকার গিথারা, আলজেরিয়ার কোইত্রা, মরোক্কোর কিত্রা এবং জিপসীদের স্কেত্রা ইত্যাদি নামের মিল থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, ধ্বণিগত এতগুলো মিল শুধুই কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না। এ বিষয়ে কিছু যোগসূত্র রয়েছে। সম্ভবত অন্যান্য দেশে 'চিত্রা' শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ ছিলো না, তাই নামে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। ল্যাটিন ভাষায় যাকে Cithara লেখা হয়, তার উচ্চারণ হচ্ছে Sitara (সিতারা)। এটি আসলে রোম দেশের বাদ্যযন্ত্র Kithara , কারণ রোমান বর্ণমালায় K এর পরিবর্তে C লেখা হয়। সেই হিসেবে Kithara হয়েছে Cithara। আবার পশ্চিমের কোন কোন ভাষায় C এর পরিবর্তে G লেখা হয়। সেজন্য রোমান ' Kithara' (ল্যাটিন 'সিতারা) নাম ধারণ করেছে Gatara বা Gitar । আবার অস্ট্রিয়া এবং আরো কয়েকটি দেশে এর নাম হয়েছে Zither অথবা Cither।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

আরব্য ও পারস্য বাদ্যযন্ত্র এবং সেতার ঃ

উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমানদের আগমণের শুরুতে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে দিল্লীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে প্রভূত পরিবর্তন আসে। পরবর্তী ছয়শ বছরে তুরস্ক, পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম এবং অন্যান্য রীতিনীতির আগমন ঘটে মুসলিম শাসকদের রাজদরবারের শিল্পী এবং জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের মাধ্যমে।

মুসলিম শাসনামলের শুরুর দিকে উত্তর ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে যে সকল বাদ্যযন্ত্রের আগমন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'তম্বুর' (কখনও 'তানবুর' নামেও পরিচিত)। এটি পর্দাযুক্ত লম্বা গলা বিশিষ্ট লিউট। হেনরী জর্জ ফার্মার রচিত 'দি ইভলিউশন অব দি তম্বুর ইন পান্ডোর' গ্রন্থ অনুযায়ী আরব রচনাবলি থেকে পর্দাযুক্ত তম্বুরের বর্ণনা প্রথম পাওয়া যায় নবম এবং দশম শতাব্দীতে এবং এর উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা যায় বাগদাদের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিচিত একটি বাদ্যযন্ত্রকে যার কথা বলা হয়েছে Measured Tambur। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে তম্বুর একটি প্রধান বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

ভারতবর্ষে ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের শাসক মুহম্মদ গজনবী কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকৃত হওয়ার সময় ভারতীয়-পারস্য কবি মাসুদ-ই সাদ-ই সালমান লাহোরের রাজসভায় আরব্য এবং পারস্য বাদ্যযন্ত্রসমূহের মধ্যে 'তম্বুর'এর কথা উল্লেখ করেছেন। দিল্লীর প্রথম দিককার পারস্য ঐতিহাসিক হাসান নিজামী ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে এর উল্লেখ করেছেন। আমীর খসরু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে দিল্লীর রাজদরবারে এই 'তম্বুর'এর কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এ সময় থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে প্রায় একই ধরণের বর্ণনা পাওয়া গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৩১ ঃ সম্রাট আকবরের আমলে অঙ্কিত (১৫৫৬-১৬০৫) মুগল চিত্রকর্মে তম্বুরের ছবি

মুগল আমলের মিনিয়েচার শিল্পকর্মে 'তম্বুর' যন্ত্রটির অত্যন্ত সুন্দর কিছু চিত্র পাওয়া গেছে। চিত্র দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যন্ত্রের মূল অংশ নাশপাতি আকারের, উপরিভাগ চেপ্টা, সাথে যুক্ত একটি সরু গলার মত অংশ যা ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে গিয়েছে। গলার শেষ অংশে তার আটকানোর জন্য সাধারণত চারটি খুঁটি থাকতো, খুঁটিগুলো দণ্ডের দুই পাশে অবস্থিত। একটি ব্রিজ বা সওয়ারি থাকতো, যা পাতলা, বর্তমান সেতারের মত নয়। পর্দাগুলো সূতা দিয়ে দণ্ডের গায়ে বাঁধা হতো। সম্পূর্ণ যন্ত্রটি কাঠের তৈরি। আমীর খসরুর বর্ণনায় পাওয়া যায় যন্ত্রে দু'টি রেশমের তার এবং দু'টি ধাতব তার ব্যবহৃত হতো। এর শব্দ ছিলো তীক্ষ্ণ। আমীর খসরুর পরবর্তী সময়ে দিল্লীর রাজদরবারে অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে তম্বুর বেশ প্রাধাণ্য লাভ করেছিলে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুগল শাসনের অব্যবহিত পূর্বে সিকান্দার লোদীর শাসনামলের একটি রচনায় রাজদরবারে নিযুক্ত সংগীতজ্ঞদের মধ্যে একজন তম্বুর বাদক একং একজন বীণাবাদকের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'আইন-ই-আকবরী'তে ছত্রিশজন সভাবাদকের নামের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে চারজন তম্বুর বাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কোন একটি যন্ত্রে এটিই সবচেয়ে বেশি বাদকের সংখ্যা। জাহাঙ্গীরের আমলের একটি অসাধারণ মিনিয়েচার চিত্রকর্মে দেখা যায় একজন তম্বুর বাদক গ্রাম্য এলাকায় বসে তম্বুর বাজাচ্ছেন। [৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৩২ ঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের অমলে অঙ্কিত (১৬০৫-১৬২৭) মুগল চিত্রকর্মে তম্বুরের ছবি

তম্বুর ছিলো সুর বাজানোর যন্ত্র। সুর ধরে রাখার যন্ত্র নয়। কালক্রমে কোন এক পর্যায়ে এসে যন্ত্রটির কিছুটা রূপান্তরের মাধ্যমে এদেশীয় যন্ত্রে পরিণত করা হয় এবং শুধু মূল সুর সম্পর্কে গায়ককে সজাগ রাখার জন্য গানোর সহযোগী দ্রোন জাতীয় যন্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবে তখন আর পর্দা ব্যবহারের প্রয়োজন থাকলো না। পর্দাবিহীন এই যন্ত্রটির পরিচিতি হলো 'তম্বুরা' নামে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরের রাজদরবারের চিত্রে এই ধরণের যন্ত্র সহযোগে গান গাওয়ার ছবি পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৩৩ ঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে অঙ্কিত (১৬০৫-১৬২৭) মুগল চিত্রকর্মে তাম্বুরা বাজিয়ে গান গাইছেন গায়ক।

এই ধরণের তাম্বুরার ব্রিজটি প্রকৃত অর্থে জওয়ারি।[৪৭] অর্থাৎ আকৃতিতে ছোট একটি চৌকির মত এবং এর চওড়া উপরিভাগের উপর দিয়ে তার প্রবাহিত হওয়ার সময় গুঞ্জন সৃষ্টি হয়, এটি উপমহাদেশের কয়েকটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তম্বুর যন্ত্রে এই জওয়ারির সংযোজন ভারতীয় বীণ থেকে এসেছে।

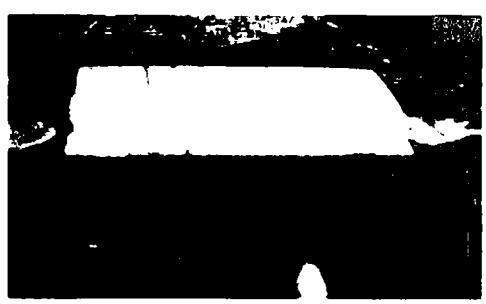

চিত্র-৩৪ ঃ জওয়ারি করা চওড়া ব্রিজ এবং চিত্র-৩৫ ঃ জওয়ারি ছাড়া পাতলা ব্রিজ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এদেশে তম্বুরাই প্রথম সুর ধরে রাখার যন্ত্র নয়। এদেশের লোকজ সংগীতে নানা ধরণের ড্রোন জাতীয় যন্ত্রের প্রচলন পূর্ব থেকেই ছিলো। যেমন, একতারা, গোপীযন্ত্র, টুনটুনে (অথবা থুনথুনে) ইত্যাদি। মিঞা তানসেনের সংগীত গুরু স্বামী হরিদাসের যতগুলো চিত্র পাওয়া গেছে তার সবগুলোতেই তাঁর হাতে একটি একতারা দেখা গেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্ভবত তাঁর মাধ্যমে মিঞা তানসেনের হাত দিয়ে একতারা যন্ত্রটি সম্রাট আকবরের দরবারে প্রবেশ করে। এভাবে ক্রমে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী এবং লোকশিল্পীদের মধ্যে আদান প্রদান বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এভাবেই তম্বুর থেকে তম্বুরার আবির্ভাবে লোকজ বাদ্যযন্ত্রের প্রভাব যুক্ত হয়েছিলো। [৪৮]

তম্বুরা নামটি আমাদের দেশে পরবর্তীকালে তানপুরা নামে প্রচলিত হয়ে যায়। দক্ষিণ ভারতে কিন্তু তা এখনো তম্বুরা নামে পরিচিত।

ইতিহাসের গতিধারায় তম্বুর এবং তম্বুরা নামে দু'টি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার পরও দু'টি যন্ত্র কিন্তু আকার এবং আকৃতিতে প্রায় একই রকম ছিলো। পার্থক্য শুধু একটিই , তা হলো তম্বুরে পর্দার উপস্থিতি এবং তম্বুরায় পর্দার অনুপস্থিতি। ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে অহোবল রচিত 'সংগীতপারিজাত' গ্রন্থে এবং প্রায় একই সময়ে ফকিরউল্লাহ্‌র 'রাগ দর্পণ' গ্রন্থে এ বিষয়ক কিছু বিবরণ আছে। এখানে দুই ধরনের তম্বুরার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, একটি 'নিবদ্ধ' (পর্দাযুক্ত) এবং অন্যটি 'অনিবদ্ধ' (পর্দাবিহীন)। দু'টি যন্ত্রই সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি বলে উল্লেখ আছে। নিবদ্ধ তম্বুরম-এ স্বর চিহ্নিত করার স্থানসমূহে তার জড়ানো আছে। বাজাবার জন্য রয়েছে চারটি তার এবং বাজাতে হয় দুই আঙুল দিয়ে।[৪৯] পারস্যপ্রভাবিত অঞ্চলে বর্তমান যুগেও তম্বুর যন্ত্রটি প্রচলিত রয়েছে। মুগল আমলের তম্বুরের সাথে এর পার্থক্য সামান্যই। চিত্রে আধুনিক যুগের একটি তম্বুর দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

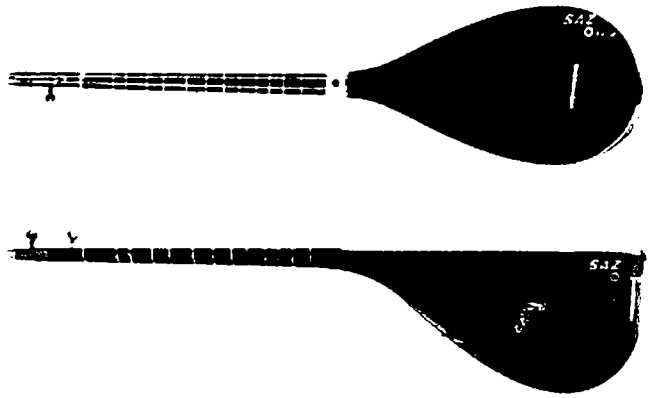

চিত্র-৩৬ ঃ আধুনিক যুগের তম্বুর

সেতারের আবির্ভাবে তম্বুরের প্রভাব প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প নিদর্শনে তম্বুরের অবিরাম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে তখন পর্যন্ত 'সেতার' নামে কোন বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্রে প্রাপ্ত যন্ত্রগুলো স্পষ্টত তম্বুর ছিলো। কারণ সেতারের সাথে এর গঠনে কতগুলো মৌলিক পার্থক্য আছে। এই মৌলিক পার্থক্যগুলোর কারণেই উক্ত চিত্রগুলো তম্বুরের, সেতারের নয়, এই মত গবেষক এলাইন মাইনারের। তিনি গবেষণা করে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছেন ঃ (১) তার আটকানোর খুঁটি বা বয়লার অবস্থান শুধু দণ্ডের দু'পাশে অর্থাৎ দণ্ডের সাথে আনুভূমিক (সেতারে আনুভূমিক ও লম্ব দু'ভাবে বয়লা লাগানো হয়), (২) দণ্ড ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে গিয়েছে (সেতারে দণ্ড সর্বদা সমান্তরাল থাকে), (৩) পাতলা ব্রিজের উপস্থিতি (প্রকৃত জওয়ারি অনুপস্থিত)। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও প্রকৃত সেতারের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু আরো পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কোম্পানী শাসনামলে ইউরোপীয় শিল্পীর আঁকা চিত্রকর্মে যায় নিদর্শন পাওয়া যায় তাকে প্রকৃতপক্ষে 'সেতার' বলে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এর তার আটকানোর খুঁটি, দণ্ডের সমান্তারল আকৃতি এবং জওয়ারি করা ব্রিজ – এ সব ক'টি বৈশিষ্ট্যই বর্তমানকালের সেতারের অনুরূপ।

১৭৯০ সালের একটি নমুনাকে প্রাথমিক সেতারের খুব কাছাকাছি বলে ধরে নেওয়া যায়। এটি হচ্ছে মহারাজা সওয়াই প্রতাপ সিং-এর পর্দাহীন তানপুরা, যা জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় সওয়াই মান সিং যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে। জয়পুরের মহারাজা সওয়াই প্রতাপ সিং নিবদ্ধ তানপুরা বলে যা পরিচিত ছিলো সেতার বলতে তাকেই বোঝানো হয় বলে মনে করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে বিষয়টি বাস্তবেও তাই হয়েছিলো বলে প্রতীয়মান হয়। যাদুঘরে প্রাপ্ত নমুনাটি যদিও তানপুরা, সেতার নয়,

Dhaka University Institutional Repository

তবু ঐতিহানিক নিদর্শন হিসেবে এর মূল্য অপরিসীম এ কারণে যে, প্রতাপ সিং তাঁর 'সংগীত সার' গ্রন্থে নিবদ্ধ তানপুরা, অর্থাৎ সেতার এবং অনিবদ্ধ তানপুরা দেখতে একবারে এক রকম, শুধু একটি পার্থক্য ছাড়া, তা হলো পর্দার উপস্থিতি, একথা উল্লেখ করছেন। যে যন্ত্রটির কথা বলা হলো, সেটির আকার বেশ ছোট, ১৮শ শতকের চিত্রকর্মে যেমনটি দেখা যায়, তবে চিত্রের সাথে পার্থক্য হলো, বয়লা দণ্ডর সাথে আনুভূমিক এবং লম্ব দুই আবস্থানেই আছে, দণ্ডটিও ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে যায় নি, দেহ লাউয়ের তৈরি এবং ব্রিজটি প্রকৃত অর্থে জওয়ারি বিশিষ্ট্য অর্থাৎ চওড়া এবং উপরিভাগ সমতল। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বলে দেয় যে, যন্ত্রটি তৎতালে প্রচলিত 'তম্বুর'এর চেয়ে পৃথক। অর্থাৎ তম্বুর থেকে এক বা একাধিক ধাপে বিবর্তন ঘটে ইতোমধ্যে অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ তানপুরার উৎপত্তি হয়েছে, নিবদ্ধ তানপুরায় পরবর্তীকালে বাজাবার পদ্ধতি, সুর মেলানোর পদ্ধতি ইত্যাদির বিশেষ কিছু কৌশল যুক্ত হয়েছে যা তম্বুর বাজানোর কৌশলের মত নয়, বরং সেতারের মত। এই কৌশলের প্রয়োজনেই তম্বুরের আকার পরিবর্তিত হয়েছে। [৫০]

চিত্র থেকে প্রাপ্ত এত সব ধারাবাহিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের পর প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সেতার যন্ত্রটি কি তম্বুর যন্ত্রের সরাসরি পরিমার্জিত রূপ?

এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ থেকে অনেক বিশ্লেষণের পরও কোন গবেষক তম্বুর এবং সেতার - এ দু'টি যন্ত্রের মধ্যে সরাসরি কোন যোগসূত্র আবস্কার করে দেখাতে পারেন নি। বরং এই দুই যন্ত্রের মধ্যে আকেটি যন্ত্রের প্রভাব ঐতিহাসিকভাবে স্বীকার করে নিতে হয়, তা হচ্ছে কাশ্মিরী সেহ্তার। মিঞা তানসেনের জামাতা নৌবাৎ খাঁর পঞ্চদশ প্রজন্মের বংশধর খসরু খাঁ (আমীর খসরু নামেও পরিচিত) কাশ্মিরী সেতার নিয়ে নানাবিধ গবেষণা করার পর সেতার উদ্ভাবন করেন। [৫১]

সংগীত শিল্পীদের পরিবারে সংগীতের যে ইতিহাস মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে তা থেকেও এ ধরণের তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায় সংগীত গবেষক এলাইন মাইনারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওস্তাদ ওমর খান উল্লেখ করেছেন যে, সেতারের আবিস্কারক খসরু খান কিছুকাল কাশ্মীরে আবস্থান করেছিলেন এবং সেখান থেকেই সেতার যন্ত্রটি আবিস্কারের ধারণা নিয়ে দিল্লীতে ফিরে আসেন। কাশ্মিরের ১৮ শতকের চিত্রকর্মসমূহে এই সেহতার যন্ত্রটির কোন ছবি দেখতে পাওয়া যায় নি। এ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা করো যায় যে রাজদরবারের বাইরে লোকজ এলাকায় এই যন্ত্রটির প্রচলন ছিলো। বরং পরিশীলিত সেতার হিসেবে যখন এর আবির্ভাব হলো তখন তা সহজেই উত্তর ভারতের রাজদরবার সমূহে স্থান করে নিলো।[৫২]

কাশ্মীরের সেহ্তার যন্ত্রটি সরাসরি পারস্য সেহ্তার যন্ত্র থেকে এসেছে। এটি পারস্যের সুফী সংগীতের সাথে সম্পৃক্ত। কাশ্মিরী সেহ্তার যন্ত্রের দেহ কাঠের তৈরি, অন্ত্রী তার দিয়ে এর পর্দা তৈরি হয়, তার থাকে সাত থেকে নয়টি। ছয়টি তারকে নির্দিষ্ট স্কেলে সুর মিলিয়ে বাঁধা হয়, যেগুলো বাঁ হাত দিয়ে বাজাতে হয় না, মূল তার বাজাবার সময় শুধু টোকা দেওয়া হয় (অর্থাৎ ড্রোন হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। সবশেষের তার দু'টি জোড়া তার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ তার দু'টি খুব কাছাকাছি থাকে এবং সর্বদা একসঙ্গে বাজানো হয়। এই তার জোড়াতেই মূল সুর বাজানো হয়। তারের সংখ্যা কম হলে দণ্ডটি সরু হয়, বেশি হলে দণ্ডটি চওড়া হয়। পারস্য সেহ্তারের দণ্ড সরু হতো এবং কাশ্মিরের সেহ্তারও প্রথম যুগে সে রকমই ছিলো। এগুলো আকারে বর্তমান সেতারের চেয়ে ছোট। কশ্মিরে বর্তমান যুগেও কাশ্মিরী সেহ্তারের চল রয়েছে।

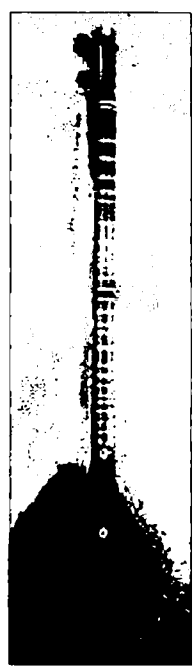

চিত্র-৩৭ এবং চিত্র-৩৮ ঃ কাশ্মিরী সেতার

কাশ্মিরে এই সেতার সেহ্তার অথবা সেতার নামে পরিচিত। সেতারের নাম এবং নামের বানান সম্পর্কে এখানে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা খুব জরুরী। সেতার যন্ত্রের নামের উৎপত্তি পারস্য দু'টি শব্দ সেহ্

Dhaka University Institutional Repository

(অর্থাৎ তিন) এবং তার (অর্থাৎ তন্ত্রী) থেকে। পরবর্তীকালে সেহ্তার নামটি সহজ হয়ে শুধু সেতার নামে পরিচিত হয়। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে আমরা যে সেতার পেয়েছি সেটি এখন এই নামে পরিচিত। এর তারের সংখ্যাও এখন আর তিন নয়, আরো বেশি। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এর ইংরেজি নামকরণ করা হয় Sitar এবং সেতারের ইংরেজি নামের এই বানানটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি এবং প্রচার লাভ করে। অপরদিকে 'সেহ্তার' নাম নিয়ে তুলনামূলক অপরিশীলিত একটি রূপ পারস্য, কাশ্মির ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচলিত রয়ে যায়। ইংরেজিতে এর বানান লেখা হয় Setar। অনলাইনে সর্বাধিক প্রচলিত এনসাইক্লোপিডিয়া উইকিপিডিয়া সহ ইন্টারনেটের সকল তথ্য উৎস এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল প্রকাশনায় দু'টি বানানের ভিন্নতা বজায় রেখে দু'টি পৃথক বাদ্যযন্ত্রকে নির্দেশ করা হয়। তবে বাংলায় 'সিতার' লেখার চল নাই। সেজন্য 'সেতার' শব্দ দ্বারা দু'টি যন্ত্রকেই নির্দেশ করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বাংলায় প্রচলিত 'সেতার' শব্দটিকে আধুনিক কালে বিশ্বব্যাপি জনপ্রিয় সেতার যন্ত্রের জন্য নির্দিষ্ট রেখেই পারস্য যন্ত্রটিকে 'সেহ্তার' বলে বর্তমান রচনায় উল্লেখ করা হলো। ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিবরণসূহে এই যন্ত্রটিন নামের বানান কখনো Setar এবং কখনো Sehtar লেখা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, পারস্য কোন যন্ত্রের প্রভাবে সেতারের উৎপত্তি সে বিষয়ে এক কথায় কোন উপসংহার দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ কোন একটি যন্ত্রের রূপান্তর নয়, বরং একাধিক যন্ত্রের প্রভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক সেতার পাওয়া যায়। এ কারণে চতুর্থ অনুমানটিকে যুক্তির সাথে বিশ্লেষণ করা দরকার।

দুই অঞ্চলের বাদ্যযন্ত্রের মেলবন্ধন - সেতার ঃ

দুই অঞ্চলের বাদ্যযন্ত্র বলতে এখানে উপমহাদেশের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রসমূহ যা প্রাচীনকাল থেকে এদেশে প্রচলিত রয়েছে সেগুলো এবং উপমহাদেশের বাইরে থেকে আগত বাদ্যযন্ত্রসমূহকে বোঝানো হয়েছে।

সেতার যন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্বে তম্বুর যন্ত্রটি দীর্ঘকাল এই উপমহাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো। তম্বুর যন্ত্রের পারস্য প্রভাবিত রূপটি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। এরপর ধীরে ধীরে এতে কিছু পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। উপমহাদেশে পূর্ব থেকে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রসমূহের প্রভাবে এই পরিবর্তনগুলো ঘটতে থাকে। মূলত বীণের (রুদ্র বীণা 'বীণ' নামে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলো)

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যগুলো সেতারে যুক্ত হতে থাকে এবং এভাবেই ভারতীয় এবং পারস্য প্রভাব মিলে মিশে একটি নতুন যন্ত্রের রূপায়নকে ত্বরান্বিত করে।

পারস্য প্রভাবিত যন্ত্রগুলোর মধ্যে শুধু তম্বুর কিংবা সেহ্তার নয়, বরং পারস্য 'উদ' এবং উজবেক 'দুতার' যন্ত্রের প্রভাবের কথাও উল্লেখযোগ্য।

চিত্র-৩৯ ঃ উজবেক দুতার

এ প্রসঙ্গে সংগীত গবেষক ড.ওয়াহিদ মির্জার মন্তব্য উদ্ধৃত করা হলো।

"উপমহাদেশে পূর্ব থেকে প্রচলিত কোন বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তনের ফল হচ্ছে সেতার, একথা প্রায় সকল গবেষকই বিশ্বাস করেন। যখন পারস্য এবং উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ শুরু হয় সম্ভবত সে সময়ে এই বিবর্তনের শুরু। সেতার যন্ত্রটি দেখতে পারস্যের তম্বুর কিংবা উদ্ নামক যন্ত্রের মত, বাদন রীতিতে আবার ভারতীয় বীণার মত। নিঃসন্দেহে এটি ভারতীয়-পারস্য মিলিত সংস্কৃতির প্রভাবে সৃষ্ট এক অনন্য সৃষ্টি।" [৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

সংগীত গবেষক ম.ন. মুস্তাফা "আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে" গ্রন্থে লিখেছেন - "সেতারের আকারে পারস্য 'উদ' এবং উপাদানে 'বীণা'র সাদৃশ্য দেখা যায়। কেবল পার্থক্য এই যে, সেতারের পর্দাগুলোকে ঘুরিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্যস্ত করে নেয়া যায়। সেতারের এই বিন্যস্তকরণ বা ব্যবস্থাপূর্বক সমন্বয় করার সুবিধার জন্য একে যে কোন সুর সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা চলে।" [৫৪]

প্রাসঙ্গিকভাবে 'উদ' যন্ত্রটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রাচীন আরবদেশে প্রচলিত 'উদ' নামক যন্ত্রটি পারস্যে পরবর্তীকালে 'বারবাত' নামেও পরিচিত। উদ যন্ত্রটির দেহ আধখানা নাশপাতির মত আকারের। এটি খাটো গলাবিশিষ্ট লিউট জাতীয় যন্ত্র। প্লেকট্রাম দিয়ে বাজাতে হয়। এর দেহ এবং ফিংগারবোর্ড কাঠের তৈরি। শব্দ প্রকোষ্ঠের উপরের অংশে একাধিক সাউন্ড হোল থাকে। প্রাচীন উদ যন্ত্রে মোট নয়টি তার থাকতো। প্রথম চারটি জোড়ায় জোড়ায় এবং শেষেরটি একক। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই যন্ত্রে পর্দার প্রচলন ছিলো, এর পর ধীরে ধীরে পর্দার ব্যবহার উঠে যেতে থাকে। চতুর্দশ শতাব্দীর পরে কোন উদ যন্ত্রে পর্দার ব্যবহার দেখা যায় না। উদের ফিংগারবোর্ডের শেষ প্রান্তে খুঁটি আটকানোর জায়গাটি পেছন দিকে বাঁকানো। প্লেকট্রাম হিসেবে পাতলা লম্বা এক খণ্ড কাঠের টুকরা ব্যবহার করা হতো। মধ্যপ্রাচ্যে উদ বাদ্যযন্ত্রের রাজা হিসেবে পরিচিত। [৫৫]

চিত্র-৪০ ঃ উদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অহোবল রচিত 'সংগীতপারিজাত' গ্রন্থে যখন নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ তম্বুরের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন থেকেই এই যন্ত্রে পরিবর্তন কিংবা বিবর্তনের সূচনা। পরবর্তী একশত বছরে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেতারের চূড়ান্ত রূপ পরিস্ফুট হয়ে আসে। লিখিতভাবে 'সেতার' যন্ত্রটির নামের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় দরগাহ্ কুলি খাঁ রচিত 'মুরাক্কা-ই-দিল্লী' (১৭৩৯) গ্রন্থে। এর আগে সমগ্র ভারতবর্ষের কোন লিখিত ইতিহাস কিংবা সাহিত্যগ্রন্থ কোন কিছুতেই সেতার নামক কোন যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কিছু পরে একাধিক হিন্দী কবিতায় এই যন্ত্রের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, কবি শাহ্ আলম রচিত 'নাদিরাত-ই-শাহী' এবং কবি যশরাজ রচিত 'হাম্মীর রাসো' ইত্যাদি। ইউরোপিয়ানদের লেখায় সেতারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৭৭ খিস্টাব্দে, এক ইউরোপিয়ান পর্যটকের লেখা ভ্রমণকাহিনীতে। প্রকৃতপক্ষে এই উপমহাদেশে সেতার যন্ত্রের আবিস্কার ঠিক কোন সময়ে হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা খুব দুরূহ ব্যাপার।[৫৬]

তবে প্রথম প্রামাণ্য দলির হিসেবে 'মুরাক্কা-ই-দিল্লী' গ্রন্থটি খুব গুরুত্ববহ। সম্রাট মুহাম্মদ শাহ রঙ্গিলের আমলে এটি লেখা হয়। বইটিতে সদারঙ্গ, অদারঙ্গ প্রমূখের বর্ণনা আছে। প্রসিদ্ধ বীণকার নিয়ামত খাঁর প্রচলিত নাম ছিলো সদারঙ্গ। তাঁর ভ্রাতস্পুত্র ফিরোজ খাঁ অদারঙ্গ নামে পরিচিত ছিলেন। 'মুরাক্কা-ই-দিল্লী' গ্রন্থে দিল্লীর রাজসভার প্রায় ষাটজন সংগীতজ্ঞ এবং তাঁদের সংগীত পরিবেশনের প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সময়কার প্রধাণ সংগীতজ্ঞ ছিলেন নিয়ামত খান। তাঁর ভাই এবং ভ্রাতস্পুত্রকেও বিখ্যাত বাদক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে –

"(নিয়ামত খানের) ভাইয়ের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাবার আশ্চর্য দক্ষতা রয়েছে। এক নাগাড়ে চার ঘন্টা ধরে তিনি বিভিন্ন ধরণের সুর (ধুন) বাজাতে পারেন, কিন্তু তাঁর এমন শৈলী যে কোন সুরের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। তাঁর এই শৈল্পিক গুণ দেখে বড় বড় সংগীতজ্ঞরা হতভম্ব। আল্লাহ্ এই দক্ষতা ও পরিপক্কতা সবাইকে দেন নি। তিনি একজন দক্ষ গায়কও।

467407

নিয়ামত খানের ভ্রাতস্পুত্র সেতার বাদনে খুব দক্ষ। তিনি অনেকগুলো নতুন কৌশল আবিস্কার করেছেন। অন্যান্য পরিচিত সব যন্ত্রে যতগুলো সুর বাজানো যায়, এই লোক সেতারে তার সবগুলোই বাজাতে পারেন।"

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই ভাইটি হলেন খসরু খান, যিনি পরে আমীর খসরু নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং ভ্রাতস্পুত্রটি হচ্ছেন ফিরোজ খান। [৫৭]

চিত্রকর্ম থেকে যদি সেতারের বিবর্তন সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে আই তাহলে বিংশ শতাব্দীর শুরু দিকে প্রাপ্ত চিত্রকর্মে সেতারের যে ছবি পাওয়া যায় সেগুলোকেই প্রাথমিক যুগের সেতারের নিদর্শন বরে ধরে নিতে হবে। আকারে ছোট হলেও এর প্রায় সব কিছুই এখনকার সেতারের মত। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে পাটনায় এক শিল্পীর আঁকা একটি জলরঙের চিত্রকর্মে এবং ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে আঁকা দু'টি পোট্রেটে এ ধরণের সেতারের চিত্র পাওয়া যায়। ছবিগুলো বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। দিল্লীতে প্রাপ্ত অপূর্ব চিত্র দু'টিতে দেখা যায়, কর্নেল জেমস স্কিনারের দু'জন কর্মচারী সুকির খান এবং জঙ্গী খান বসে সেতার বাজাচ্ছেন। সেতারের প্রতিটি ডিটেইল এই চিত্রে বোঝা যায়। যেমন, চেপ্টা আকৃতির পর্দা, যা সোনালী রঙে আঁকা হয়েছে, যন্ত্রে তারের অবস্থান (দণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় যাতে তার টেনে মীড় বাজানো সম্ভব হয়) এবং বাঁ হাতের আঙুলের সাহায্যে মীড় টানলে যে ভঙ্গি হয় সে ধরণের ভঙ্গি ইত্যাদি।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

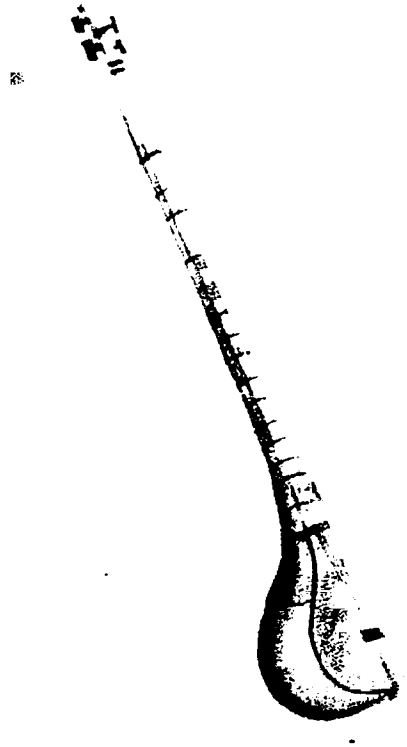

চিত্র-৪১ ঃ পাটনায় প্রাপ্ত সেতারে ছবি

চিত্র-৪২ ঃ সুকির খাঁ

চিত্র-৪৩ ঃ জঙ্গী খাঁ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমান্বয়ে সেতার যন্ত্রের নানা বিবর্তন ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুকির খানের হাতে যেমন ছোট আকারের সরু দণ্ডবিশিষ্ট সেতারের পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে কোন কোন চিত্রে চওড়া দণ্ডবিশিষ্ট সেতারের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বেলজিয়ান লেখক এবং শিল্পী এফ. বালথাজার্ড সলভিন্‌স-এর লেখা বই 'A Collection of two hundred and fifty coloured echings descriptive of the manners, customs and dress of the Hindus', যা প্রথমে কোলকাতায় প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, পরে লন্ডন এবং প্যারিস থেকেও প্রকাশিত হয়, তাতে যে সেতারের ছবি আঁকা হয়েছে তার দণ্ড চওড়া এবং যন্ত্রটি ছয় তার বিশিষ্ট। ব্রিজ কিছুটা পাতলা হলেও উপরিভাগ সমতল, অর্থাৎ জওয়ারি বিশিষ্ট। আগের সেতারগুলোর চেয়ে এর আকার বড়। শুধু আকারের পার্থক্য নয়, মূল লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হলো, এখানে দণ্ডের উপরিভাগ অর্থাৎ পটরীর উপরে এক প্রান্ত থেকে আপর প্রান্ত পর্যন্ত সবটা অংশ জুড়ে তার ছড়ানো রয়েছে। এই ধরণের সেতারে বাঁ হাতের সাহায্যে তার টেনে মীড় বাজানোর সুযোগ নাই। তবে মজার ব্যাপার এই যে, বর্তমান যুগেও অঞ্চলভেদে ভারতের কোন কোন অংশে এ ধরণের সেতারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমন, গুজরাটে 'দেশী সেতার' নামে যা প্রচলিত সেটির দণ্ড এই রকম চওড়া এবং এর বাজ তার হচ্ছে একজোড়া তার, একত্রে দু'টি তার বাজানো হয়। এই তার দু'টির অবস্থান পটরীর একেবারে শেষ প্রান্তে। অর্থাৎ এই তার টেনে মীড় বাজানো সম্ভব নয়। খরজ ইত্যাদি মিলিয়ে আরো ছয় থেকে আটটি তার এতে আছে, যেগুলো বাঁ হাতে বাজাতে হয় না, ড্রোন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক সেতারে এতগুলো তার থাকে না এবং পটরীর মধ্যভাগেই তারগুলো শেষ হয়ে যায়। বাকী অংশ খালি রাখতে হয় বাজ তার বা মূল তার বাঁ হাতে টেনে মীড় বাজানোর জন্য। [৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪৪ ঃ ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত সলভিন্‌স অঙ্কিত চওড়া দণ্ডবিশিষ্ট সেতারের ছবি।

সলভিন্‌স তাঁর দেখা সেতার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেন নি। বাদকদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- "এরা মাঝে মাঝে এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় হাত সরিয়ে সুর বাজায়, এর চেয়ে একজন ইউরোপীয় লোকের হাতে দিলে যন্ত্রটি আরো ভাল বাজাতে পারতো।"

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, দিল্লীর রাজদরবারে যে ধরণের সেতারের পরিচয় পাওয়া যায় এটি সে ধরণের সেতার নয়। চিত্র দেখেও বোঝা যায় যে এই সেতার মীড় বাজানোর উপযোগী নয়। সম্ভবত এই যন্ত্র গৎ-তোড়া বাজিয়ে একক বাদন পরিবেশনের উপযোগী ছিলো না। উন্নতমানের নিজস্ব ঘরানার স্টাইলে সংগীত পরিবেশন বলতে আমরা যা বুঝি তার পরিচয় পাওয়া যায় মসিত খাঁর বাজে। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'শরমাইয়া-ই-ইশরাত' গ্রন্থে দিল্লী বাজের কথা বলা হয়েছে। মসিত খাঁ এই স্টাইলে বীণকারদের মত বাজনা বাজাতেন মীড়, ঠোক এবং ঝালা সহকারে। 'সংগীত সুদর্শন' গ্রন্থে সুদর্শন শাস্ত্রী লিখেছেন, মসিত খাঁ তাঁর পিতার কাছ থেকে সেতার বাদন শিক্ষা লাভের পর সেতার যন্ত্রকে অনেক পরিশীলিত করেছেন। পরিশীলিত করার ফলেই তাতে ধ্রুপদ অঙ্গ তথা বীণের কারুকাজ উপস্থাপন করা সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। সুকির খাঁ এবং জঙ্গী খাঁর হাতে যে ধরণের সেতার দেখা গেছে তা সম্ভবত এই ধরণের সেতার। কারণ চিত্র দেখেই বোঝা যায় যে, এতে মীড়, গমক ইত্যাদি বাজানোর সুযোগ রয়েছে।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দী সেতারের ইতিহাসের জন্য খুব গঠনমূলক একটি সময়। এ সময়ে সেতার বাদকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অগণিত পেশাদারী এবং সৌখিন বাদকের হাতে এসে সেতারের দ্রুত বিবর্তন ঘটতে থাকে।

১৮৫৫ খিস্টাব্দে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে সেতার দেখার পর ফ্রাংকয়েস জোসেফ ফেটিস তাঁর "Histoire generale de la musique: depuis les temps les plus anciens jusqu'a nos jours" গ্রন্থে সেতারের তারের বিবরণ দিয়ে বলেছেন – এর পাঁচটি মূল তার আছে যেগুলো গলা বরাবর অতিক্রান্ত হয়ে হরিণের হাড়ের তৈরি ব্রিজের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে খুঁটিতে আটকানো হয়। আরো দু'টি তার গলার বাম পাশে বেশ নিচে লাগানো দু'টি খুঁটিতে আটকানো হয়। এই দু'টি তার কিভাবে বাঁধা হয় তা ফেটিসের ভাষায় শুনলে যথার্থ হবে। "These two harmonize in unison with the notesproduced by the progression of the fingers on the principal strings"

স্পষ্টত এখানে চিকারীর তারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসে এটিই সেতারে চিকারীর তারের সর্বপ্রথম বিবরণ। [৬০]

১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ করম ইমাম রচিত 'মাদান-আল-মসিকী' গ্রন্থে বিখ্যাত সব সেতার বাদকদের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এ সকল বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ সময়ের মধ্যে সেতার অত্যন্ত উন্নতমানের যন্ত্রে পরিণত হয়েছিলো। বিশেষ করে জয়পুরের সেনিয়াদের হাতে এর প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। এরপরও ধ্রুপদ অঙ্গের বিস্তারিত আলাপচারী, যা সাধারণত বীণে বাজানো হতো, তা তখনকার সেতারে বাজানো সম্ভব ছিলো না। সেজন্য দেখা যায়, 'সুরবীণ' নামে একটি যন্ত্র এবং 'বীণ-সিতার' নামে অপর একটি যন্ত্র সে সময় আবির্ভূত হয় আলাপচারীর প্রয়োজন মেটাতে। 'সুরবীণ' ছিলো রুদ্র বীণা এবং সেতারের সমন্বয়। 'বীণ-সিতার' যন্ত্রে তিনটি তুম্বা এবং তরফের তার ব্যবহৃত হতো। তবে এ যন্ত্রগুলোর কোনটি স্থায়ীত্ব লাভ করে নি। বরং আরেকটি যন্ত্র এ সময়ে আবিস্কৃত হয়, যার নাম 'সুরবাহার', এ যন্ত্রটি

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী সময়ে বেশ দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সুরবাহারে তরফের তার ছিলো, প্রাচীন সেতারে ছিলো না। এটি ছিলো সেই সময়ে সেতারের সাথে উল্লেখযোগ্য একটি পার্থক্য।

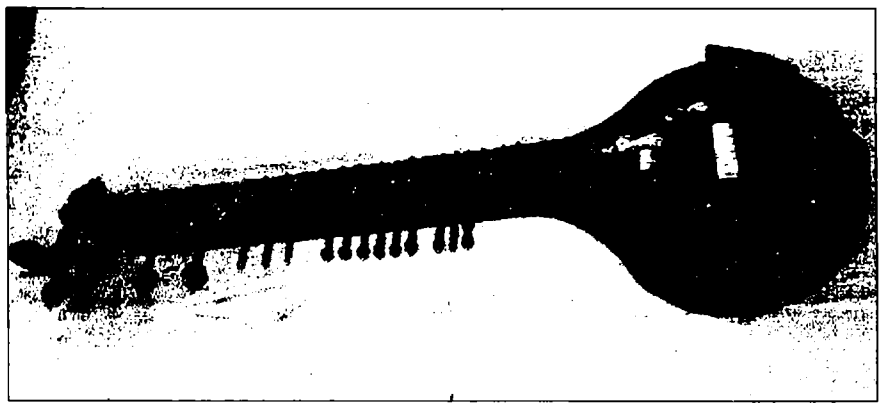

চিত্র-৪৫ ঃ সুরবাহার

বীণ-সিতার, সুরবাহার ইত্যাদি যন্ত্র নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি সেতার যন্ত্রে পরিমার্জনা অব্যাহত থাকে। একে আলাপচারীর উপযুক্ত করে তোলার জন্য গবেষণা হতে থাকে। সুনিরা কাশলিওয়ালের রচনা থেকে জানা যায়, ঊনবিংশ শতকের শেষ অর্ধাংশের কোন সময়ে সেতারে তরফের তার সংযোজিত হয়। এ সময়ে সেতারের আকারও আগের চেয়ে বড় হয়। জয়পুরের সেতারীরা তিন তুম্বা বিশিষ্ট সেতার বাজাতেন। তবে পরিবর্তন ও পরিশোধনের শেষ পর্যায়ে এসে একটি তুম্বা কমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দু'টি তুম্বা অবশিষ্ট রইলো। একটি হলো দেহের মূল অংশ এবং অপরটি হলো একটি ছোট লাউ যা দণ্ডের প্রায় শেষ প্রান্তে সংযুক্ত থাকে। এটি স্ক্রুর সাহায্যে সংযুক্ত থাকে, প্রয়োজনে খুলে ফেলা যায়। এ সমস্ত পরিবর্তন এবং পরিশোধনের একটি মূল উদ্দেশ্য ছিলো বীণ অঙ্গের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য সেতারে বাদনের উপযোগী করে তোলা। বর্তমানে এই উদ্দেশ্য সফল বলা চলে। এক সময়ে রেওয়াজ ছিলো এ রকম যে, শিল্পী প্রথমে সুরবাহার যন্ত্রে আলাপ বাজতেন, পরে সেতার নিয়ে বসে গৎ, তান ইত্যাদি বাজিয়ে পরিবেশনা শেষ করতেন। বর্তমানে আর তেমন করা হয় না। সেতার যন্ত্রটি এখন আলাপ বাজানোর জন্য খুব উপযুক্ত। একই যন্ত্রে প্রথমে আলাপ, জোড় আলাপ ইত্যাদি বাজিয়ে পরে গৎ, তান, ঝালা ইত্যাদি বাজানো হয়। বিশেষ করে আধুনিক যুগের শিল্পীদের মধ্যে পণ্ডিত রবি শঙ্করের বাদন শৈলীর কথা উল্লেখ না করলে এতদ্‌সংক্রান্ত আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সেরা শিষ্যদের অন্যতম পণ্ডিত রবি শঙ্কর। সেনীয়া ঘরানার মূল বৈশিষ্ট্য আলাপচারীর কাজ। বিস্তারিত আলাপচারীর কাজ ওস্তাদ

Dhaka University Institutional Repository

আলাউদ্দিন খাঁর ঘরানারও মূল বৈশিষ্ট্য। আলাপচারীর সমস্ত শিক্ষা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ দিয়ে গেছেন শিষ্য রবি শঙ্করকে। রবি শঙ্কর মূল তারে বাদনের পরে খরজের তারে অথাৎ খাদে মীড় পরিবেশনের মাধ্যমে যেভাবে সুরবাহারের বৈশিষ্ট্যে আলাপ পরিবেশন করে থাকেন তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। আলাপে সুরবাহারের যে বৈশিষ্ট্য, শ্রোতারা সেটি যেমন পেয়ে থাকেন, তেমনি সেতারে বাজানো গৎ তানের কাজও শ্রোতারা উপভোগ করে থাকেন। অর্থাৎ একটি যন্ত্রের পরিবেশনা থেকে পূর্ণতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন শ্রোতারা। ইতিহাসের আলোকে বলা চলে বর্তমানে প্রচলিত সেতার হচ্ছে এই যন্ত্রের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রূপ। [৬১]

প্রচলিত তত যন্ত্র সরোদ ঃ –

সেতারের মত সরোদ আবিস্কারের ইতিহাসও কিছুটা অস্পষ্ট। সরোদ যন্ত্রটি একদিনে তৈরি হয় নি। বারংবার পরিশীলনের মাধ্যমে সরোদ বর্তমান আকার এবং রূপ ধারণ করেছে এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিধা নাই। তবে এর মূল উৎপত্তি কোথায় তা অনুসন্ধান করা দরকার। রবাব, সুর শৃঙ্গার, চিত্রা বীণা ইত্যাদি যন্ত্র সরোদের পূর্বসূরী হতে পারে, তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একথা বলা যায়। বিশেষ করে রবাবের সাথে সরোদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি সবচেয়ে আলোচিত। তবে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে এই যন্ত্র নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো আলোচনা করা দরকার এবং বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা দরকার।

অনেকেই সরোদকে প্রাচীন সরোদীয় বীণার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। নামের মিল সম্ভবত এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় সারদীয় বীণা নামক যন্ত্রটির উল্লেখ পাওয়া গেছে শুধু সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে। সংগীত তত্ত্ব বিষয়ক যে সব বই লেখা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় সেগুলোতে সারদীয় বীণার উল্লেখ পাওয়া যায় নি। এর কোন বৈশিষ্ট্য কিংবা বর্ণনা কিছুই কোথাও পাওয়া যায় নি। প্রকৃতপক্ষে ধ্বণিগত সাদৃশ্য ছাড়া সরোদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। [৬২]

অনেকে রুদ্রবীণার সাথে সরোদের আবির্ভাবকে সম্পর্কযুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত এখানেও রুদ্র বীণার অন্তর্গত 'রুদ' শব্দটি এই ধারণাকে প্রভাবিত করেছে। এর পেছনে আরেকটি বিভ্রান্তিকর কারণ থাকতে পারে, তা হলো অনেকে রুদ্র বীণা এবং রবাবকে অভিন্ন বলে ভাবার চেষ্টা করেছেন। রুদ্র বীণা উপমহাদেশে প্রচলিত একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত বীণা যা অনেক ক্ষেত্রে শুধু বীণ নামেই

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত। বাঁশের তৈরি দণ্ড হচ্ছে এই যন্ত্রের মূল কাঠামো এবং তার নিচে দু'টি লাউ সংযুক্ত থাকে। দৃশ্যত বোঝা যায় এ যন্ত্রটি একটি দণ্ডাকৃতি জিথার। পক্ষান্তরে রবাব একটি লিউট জাতীয় যন্ত্র। রবাব যন্ত্রের সাথে রুদ্র বীণার কোন মিলও নাই। কাজেই রবাব থেকে সরোদের উৎপত্তি, এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কেউ যদি রুদ্র বীণা থেকে সরোদের উৎপত্তি বলে মত প্রকাশ করেন তবে আকে বাস্তবসম্মত বলা যায় না। কাজেই রুদ্র বীণা থেকে সরোদ উদ্ভাবনের ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। [৬৩]

রবাবের সাথে সরোদের মিল সবচেয়ে বেশি। রবাব থেকে সরোদ উদ্ভাবনের পক্ষে যুক্তিও সবচেয়ে বেশি। তবে এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করা দরকার রবাব বলতে আসলে কোন যন্ত্রটিকে বোঝানো হয়। কারণ রবাব কিন্তু একাধিক আকৃতির ছিলো। মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের শুরুতে মূলধারার হিন্দুস্তানী সংগীতের জগতে অন্তত তিন বা চার ধরণের রবাবের আগমন ঘটেছিলো। সেজন্য সরোদ যন্ত্রের উদ্ভবের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা আগে আমাদের অবশ্যই বিভিন্ন ধরণের রবাবের বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা দরকার।

পারস্য রবাব ---

রবাব যন্ত্রের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হেনরি জর্জ ফার্মার রচিত " Studies in Oriental Musical Instruments" গ্রন্থে যেখানে রবাবকে ছড়ের সাহায্যে বাজানোর যন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [৬৪] এই যন্ত্রটিই ভারতের বাইরে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কোথাও রুবাব, কোথাও রেবাব অথবা রবব নামে পরিচিত ছিলো। আরব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই যন্ত্রটি বাজানো হতো ছড়ের সাহায্যে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বাইরে যে রবাব প্রচলিত ছিলো তা ছড়ের সাহায্যে বাজানো হতো।

ভারতবর্ষে যে ধরণের রবাবের প্রচলন ছিলো সেটি ছড় দিয়ে বাজানো হতো না, আঙুলের সাহায্যে টোকা দিয়ে বাজানো হতো। এতে কোন পর্দা ছিলো না।

মুগল রাজদরবারের প্রথম দিককার চিত্রকর্মে প্রায়শ রবাব যন্ত্রটির চিত্র পাওয়া যায়। এসব চিত্রে রবাবের একটি নির্দিষ্ট আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। চিত্র থেকে বোঝা যায় এই যন্ত্রের দেহ থেকে একটি কলার একে গলার মত অংশের সাথে যুক্ত করেছে। কলার থেকে শুরু করে গলার দিকের অংশটা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে গিয়েছে। এই বাঁকানো কলারের মত অংশটি প্রথম দিককার চিত্রে ততটা স্পষ্ট নয়, পরবর্তীকালের চিত্রে তা যতটা স্পষ্ট। গলার যে অংশে খুঁটি বা বয়লা থাকে সেটি লম্বা এবং শেষ প্রান্তে গিয়ে তা কোণাকুনিভাবে বেঁকে গেছে। চামড়ার ছাউনি দেওয়া দেহ কিছুটা গোলাকৃতির। এই ধরণের রবাবকে পারস্য রবাব বলে অভিহিত করা হয়।

চিত্র-৪৬ ঃ পারস্য রবাব

ধ্রুপদ রবাব ––

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশীয় সংগীতের জগতে রবাব অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিগণিত ছিলো। মুগল আমলের শেষ দিকের চিত্রকর্মে এবং প্রাদেশিক এবং পাহাড়ী চিত্রকর্মে রবাবের যে চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় এর দেহ বেশ বড় আকৃতির, গোলাকার এবং চামড়ার ছাউনি দেওয়া। দেহ এবং গলার মত অংশের মাঝখানে বিশেষ ধরণের কলারের উপস্থিতি আছে। কলারটি বাঁকানো। গলার শেষ অংশটি ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে খুঁটি আটকানোর জায়গা বা পেগ বক্সে পরিণত হয়েছে এবং এ অংশটি খুব সুন্দর নকশা করা। শেষ অংশটি গোলাকার অথবা চাকার মত ঘোরানো। এটি

Dhaka University Institutional Repository

সরু গলার পেছন দিকে চলে গেছে। এই ধরণের রবাবকে ভারতীয় বা ধ্রুপদ রবাব বলে অভিহিত করা হয়।

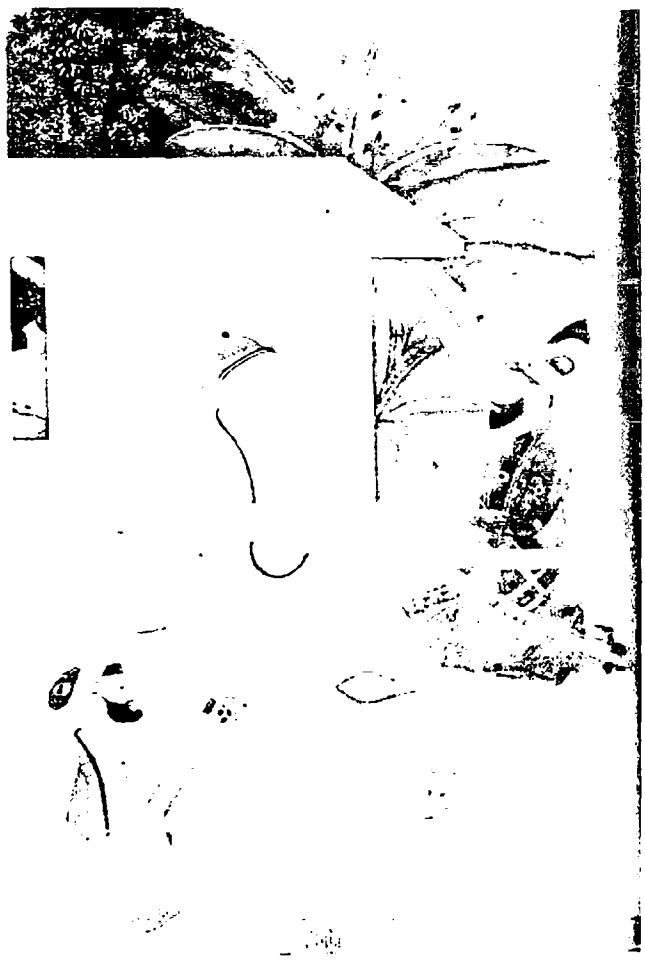

চিত্র-৪৭ ঃ ধ্রুপদ রবাব

ইতিহাসে এই ধ্রুপদ রবাবের সাথে প্রখ্যাত সংগীত গুণী সম্রাট আকবরের সভা সংগীতজ্ঞ মিঞা তানসেনের নাম জড়িত। মিঞা তানসেনের বংশে এই রবাবের বিশেষ অবস্থানের কারণে এই রবাব সেনিয়া রবাব নামেও পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক চিত্রকর্মে মিঞা তানসেন এবং অন্যান্যদের হাতে সেনিয়া রবাবের বহু ছবি দেখা যায়। অবশ্য মিঞা তানসেন এবং তাঁর বংশধরধের হতে প্রাচীন রবাব

Dhaka University Institutional Repository

অনেকখানি পরিশীলিত রূপ লাভ করেছিলো। তানসেনের পুত্র বিলাস খানের বংশধরেরা 'রবাবিয়া' হিসেবে বংশ পরম্পরায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। [৬৫]

পারস্য প্রভাবিত রবাব যন্ত্র এদেশে প্রচলিত হওয়ার পর এদেশীয় ধ্রুপদী সংগীত পরিবেশনের উপযোগী করার তাগিদে এর আকার অবয়ব ইত্যাদিতে পরিবর্তন আসতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নানারূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই রবাবের জনপ্রিয়তা অব্যাহত থাকে। ইতিহাসখ্যাত বিভিন্ন সংগীতজ্ঞ এবং লেখকদের রচনায় বিভিন্ন যুগে রবাব যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হজরত আমীর খসরু তাঁর রচনায় এই যন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে একাধিকবার রবাবের কথা বলা হয়েছে। তৎকালীন রবাবে দু'টি তার থাকতো বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, একটির নাম 'বাম' অন্যটির নাম 'জির'। [৬৬]

ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে রবাব যন্ত্রের উল্লেখ অছে এবং বলা হয়েছে এতে বারো থেকে আঠারোটি তার থাকে। [৬৭] সপ্তদশ শতাব্দীতে ফকিরুল্লাহ্ তাঁর 'রাগ-দর্পণ' গ্রন্থে রাবব নামক যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "রবাবের ছয়টি তাঁতের তার থাকে, তবে কেউ কেউ সাত থেকে বারোটি তার ব্যবহার করে। যে সকল যন্ত্রে বেশি তার থাকে সেগুলোতে তামার তার ব্যবহার করা হয়। এর দু'টি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, বর্ষাকালের আর্দ্র বাতাসে তাঁতের তার ঢিলা হয়ে যায় এবং ফলে সুরে বৈকল্য ঘটে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য তামার তারের প্রয়োজনীয়তা আছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এর ব্যবহারে চুটকলা এবং খেয়ালের সঙ্গে সংগত যথাযথভাবে হতে পারে এবং বাদ্যের কোমলতা বজায় থাকে।" [৬৮]

একইভাবে 'সরমাইয়া-ই-ইসরাত' গ্রন্থে রবাবে ধাতব তার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটি সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের অনুরূপ। ধারণা করা যায় এক পর্যায়ে এসে সুরশৃঙ্গার যন্ত্রটি রবাবকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। এখানে বলা হয়েছে প্রথম এবং পঞ্চম তারটি স্টিলের এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ তারটি পিতল অথবা ব্রোঞ্জের তৈরি।

Dhaka University Institutional Repository

মিঞা তানসেনের আমলের পরবর্তী আরো দু'শো বছর রবাব যন্ত্র আধিপত্যের সাথে প্রচলিত ছিলো। মিঞা তানসেনের কন্যাবংশীয়রা বীণ বাজাতের এবং পুত্রবংশীয়রা রবাব বাজাতেন। এই দুই যন্ত্র একত্রে সুরশৃঙ্গার, সেতার এবং সরোদ যন্ত্রের বাদন কৌশলকে প্রভাবিত করেছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রবাবের প্রচলন ধীরে ধীরে কমে আসে। শেষ পর্যন্ত যাঁরা রবাবের চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হচ্ছেন গয়ার বাসত খানের পুত্র মুহম্মদ আলী খান। অপর একজন হচ্ছেন ওয়াজির খাঁর শিষ্য সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান।

আফগানী অথবা কাবুলী রবাব –

আফগানিস্তান থেকে একেবারে ভিন্ন ধরণের রবাব অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে আবির্ভূত হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতীয় রাজদরবারের কোন চিত্রকর্মে এই রবাবের ছবি পাওয়া যায় না। লোক পরম্পরায় প্রচলিত বর্ণনা থেকে এই যন্ত্র সম্পর্কে জানা যায়। প্রথম দিকে এই যন্ত্র নগর অঞ্চলের বাইরে লোকজ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে প্রচলিত ছিলো, পরে হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের মূলধারায় যুক্ত হয় সরোদ হিসেবে রূপান্তরের মাধ্যমে। আফগানিস্তানে এখনো এই রবাব, যা আফগানী রবাব বা কাবুলী রবাব নামে পরিচিত, তা একটি আঞ্চলিক বাদ্যযন্ত্র হিসেবে লোকপ্রিয়তার সাথে টিকে আছে। পাকিস্তানের কিছু অংশে এবং কাশ্মিরেও এই যন্ত্রটি দেখা যায়। আফগানী রবাব হচ্ছে ছোট গলাবিশিষ্ট লিউট। এর দেহ সরু এবং কোমর গভীরভাবে কাটা। সমস্ত যন্ত্রটি একখণ্ড কাঠ কেটে তৈরি করা হয়েছে। কোমর থেকে গলার দিকে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে গিয়েছে। আফগানী রবাবের ফিংগারবোর্ড কাঠের তৈরি, এর উপরের প্রান্তে দুই থেকে চারটি অস্ত্রী তারের তৈরি পর্দা বাঁধা থাকে।

আফগানী রবাবের উৎপত্তিস্থল প্রকৃতপক্ষে কোথায় স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, গজনীতে এর উৎপত্তি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাবুলে অবস্থিত তৈমুর শাহের দরবারে এর বিকাশ সাধন ঘটে। খুব দ্রুত এটি উত্তর ভারতে স্থানান্তরিত হয়। মুগল চিত্রকর্মে আফগানী রবাবের ছবি পাওয়া না গেলেও এই রবাবের যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তার সাথে সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত মুগল চিত্রকর্মে একজন লোকশিল্পীর হাতে বাদনরত একটি যন্ত্রের খুব মিল পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪৮ ঃ লোকশিল্পীর হাতে প্রাচীন আমলের কাবুলী রবাব

১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়ার্ড আফগানী রবাবের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন –

"এই যন্ত্র অস্ত্রী তার দিয়ে বাজানো হয় ... শিং দিয়ে তৈরি একটি প্লেকট্রাম ডান হাতের তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চেপে ধরে তা দিয়ে বাজানো হয়, বাঁ হাতের আঙুলের সাহায্যে ফিংগারবোর্ডের উপরে তার চেপে ধরে বাজানো হয়।" [৬৯]

প্রায় একই ধরণের রবাব আফগানিস্তানে বর্তমান যুগেও প্রচলিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

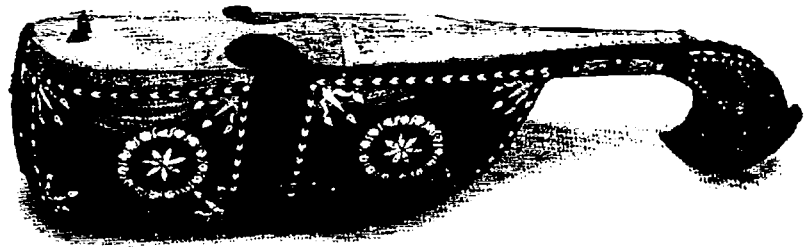

চিত্র-৪৯ ঃ আফগানিস্তানে প্রচলিত আধুনিক রবাব

কাশ্মিরী রবাব –

কাশ্মিরে আরেক ধরণের রবাবের সন্ধান পাওয়া যায়, কাশ্মিরী রবাব নামে যা পরিচিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এটি দেখতে অবিকল আফগানী রবাবের মত। তবে আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সরোদ আবিস্কারের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে গবেষকরা এই রবাবকে কখনো কোন আলোচনায় আনেন নি। কাজেই ইতিহাস অনুসন্ধান করে জানা যায় না এই যন্ত্র আফগানিস্তান থেকে কাশ্মিরে এসেছিলো নাকি কাশ্মির থেকে আফগানিস্তানে গিয়েছিলো অথবা দুই অঞ্চলেই পৃথকভাবে যন্ত্রটি বিকাশ লাভ করেছিলো। ইতিহাস থেকে শুধু এটুকু উদ্‌ঘাটন করা যায় যে, আফগানিস্তান থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধরণের ছোট গলার লিউট জাতীয় যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এই যন্ত্রগুলো তারে টোকা দিয়ে বাজানো হতো। যেমন চিত্রা বীণা। [৭০]

সরোদ উদ্ভাবন সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ ঃ

রবাব বিশেষত আফগানী রবাবের সাথে সরোদের মিল সবচেয়ে বেশি। রবাব থেকে সরোদ উদ্ভাবনের পক্ষে যুক্তিও সবচেয়ে বেশি। ড.এলাইন মাইনারের মতে আফগানী রবাব থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সরোদ উৎপত্তির সম্ভাবনাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধারণা। [৭১] তবে এ সম্পর্কে দু'টি মতবাদ রয়েছে।

প্রথম মতবাদ অনুসারে আফগানী রবাব থেকে সরোদের উৎপত্তি। বর্তমান ভৌগোলিক পরিসীমা অনুযায়ী আফগানিস্তান এবং উত্তর পাকিস্তানের কিছু অংশে বসবাসকারী পশ্‌তুন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে

Dhaka University Institutional Repository

রবাবের চর্চা চলে আসছে। এই রবাব আফগানী রবাব অথবা কাবুলি রবাব নামে পরিচিত। আকৃতির দিক থেকে এর সাথে বর্তমান সরোদের অসাধারণ মিলও রয়েছে।

দ্বিতীয় মতবাদ অনেকটা প্রথম মতবাদের অনুরূপ। অর্থাৎ পশ্তুন বাদকদের হাতে যে রবাবের চর্চা হয়ে এসেছে সে বিষয়ে এখানে কোন দ্বিমত নাই। তবে এই মত অনুসারে ঐতিহাসিক পটভূমির বিবেচনায় এই রবাবের মূল খুঁজে নিতে হবে আরো পেছন থেকে। পশ্তুনিস্তানে প্রচলিত রবাবের উৎপত্তি আসলে প্রাচীন গ্রিসে। আলেকজান্ডারের অভিযানের সময় এই যন্ত্রটি পশ্তুনিস্তানে আসে। মূল যন্ত্রটির আবিস্কারক ছিলেন পিথাগোরাস। এই মতের পক্ষে কিছু যুক্তি এবং তথ্য প্রমাণ রয়েছে, যে কারণে এর গ্রহণযোগ্যতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।[৭২] ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত "সরমাইয়া-ই-ইসরাত" গ্রন্থে "রবাব সিকান্দারী" নামে এক ধরণের রবাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সিকান্দার নামটি এসেছে আলেকজান্ডার থেকে। এই যন্ত্র আলেকজান্ডারে সাথে এই অঞ্চলে এসেছিলো বলে লোকমুখে প্রচলিত আছে। এই যন্ত্রে চারটি অন্ত্রী তার থাকতো এবং সাতটি তরফের তার থাকতো। মূল তারগুলোর সুর বাঁধা হতো এভাবে – প্রথম দু'টি তার 'স' স্বরে, এ দু'টি জোড়া তার, দ্বিতীয় তারটি 'প' স্বরে এবং শেষের তারটি 'স' স্বরে বাঁধা হতো। সপ্তকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তরফের তার বাঁধা হতো। ত্রিভূজাকৃতির জওয়া দিয়ে বাজানো হতো। গ্রন্থে এই যন্ত্রের একটি চিত্রও দেওয়া হয়েছে।[৭৩]

চিত্র-৫০ ঃ রবাব সিকান্দারী

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় আরেকটি মতবাদ রয়েছে সরোদের আবির্ভাব প্রসঙ্গে। প্রথম এবং দ্বিতীয় মতবাদ থেকে এটি কিছুটা ভিন্ন। এই মত অনুসারে খাটো গলাবিশিষ্ট সম্পূর্ণভাবে উপমহাদেশের নিজস্ব একটি যন্ত্র চিত্রা বীণা (প্রাচীন লিউট জাতীয় যন্ত্র) থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সরোদের উৎপত্তি হয়েছে। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রাচীন গুহাচিত্রে এই ধরণের বীণার চিত্র আবিস্কৃত হয়েছে। এটি রবাবের মত একটি যন্ত্র। প্রাচীন চিত্রা বীণা থেকে বিবর্তনের ধারায় একদিকে যেমন সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে,তেমনি সরোদেরও উৎপত্তি হয়েছে। [৭৪]

চিত্র-৫১ ঃ চিত্রা বীণা

প্রাচীন গুহাচিত্র থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, মুসলিম শাসকদের আগমণের বহু আগে থেকেই এদেশে রবাব জাতীয় যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিলো। তবে মজার ব্যাপার এই যে, সেতারের ক্ষেত্রে যেমন প্রাচীন মন্দির চিত্রে পাওয়া লিউট যন্ত্রের সাথে সেতারের সরাসরি কোন যোগ দেখানো যায় না, এখানেও ঠিক তেমন মন্দিরে প্রাপ্ত রবাব জাতীয় যন্ত্র যা পাশ্চাত্য গবেষকদের লেখায় "Gandharan Lutes" নামে

Dhaka University Institutional Repository

অভিহিত হয়েছে তার সাথে রবারের সরাসরি কোন যোগ আবিস্কার করা যায় না।[৭৫] তবে আকার এবং কাঠামোগত সাদৃশ্যের বিবেচনায় এই অনুমানটিকে একোরে অস্বীকার করা যায় না। ওস্তাদ আলী আকবার খান এবং শরণ রাণীর মত অনেক বিখ্যাত শিল্পী এই মতবাদে বিশ্বাসী।

সরোদের পূর্বসূরী হিসেবে কখনো চিত্রা বীণা কখনো রবাব কখনো সুরশৃঙ্গারকে বিবেচনা করা হয়েছে। ড. এড্রিয়ান ম্যাকনিলের মতে বিষয়টিকে এভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, প্রাচীন কাল থেকেই উত্তর ভারতে এবং আশেপাশের অঞ্চলে তারে টোকা দিয়ে বাজানো হয় এমন ধরণের খাটো গলার লিউট জাতীয় যন্ত্রের প্রচলন ছিলো। পশ্তুন রবাব এবং চিত্রা বীণাকে পরস্পর বিরোধী ধরণের দু'টি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বিবেচনা না করে অন্যভাবে বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে। গুহাচিত্র থেকে, প্রাচীন ইতিহাস থেকে এবং নৃতাত্ত্বিক আবিস্কার থেকে যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে ধারণা করা যেতে পারে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশ এবং এর আশেপাশের বিরাট এলাকা অর্থাৎ পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে হিমালয় অতিক্রম করে উত্তরের সমভূমি, সেখান থেকে পূর্বে আসাম এবং বাংলাদেশ – এই সমগ্র অঞ্চল জুড়ে যুগ যুগ ধরে খাটো গলা লিউট জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের চর্চা হয়ে এসেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে পশ্তুনদের রবাব হোক অথবা অন্য কোন যন্ত্র হোক সবগুলোকে একটি বিশাল ভৌগোলিক এলাকার একই গোত্রের লিউট জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্গত বলে ধরে নেওয়া যায়। এগুলো সবই তারে টোকা দিয়ে বাজানোর যন্ত্র। আঞ্চলিকতার প্রভাবে এক একটি সংস্কৃতিতে প্রচলিত যন্ত্রগুলোর মধ্যে কিছু মিল অমিল লক্ষ্য করা যায় এই যা পার্থক্য।[৭৬]

ঠিক একই ধরণের মনোভাব সংগীত গবেষক এবং লেখক দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়েরও। আফগানিস্তানে প্রচলিত কাবুলি রবাব, যা কোন কোন ক্ষেত্রে 'সুরুদ' নামেও পরিচিত, ভারতবর্ষে এসে তার নাম ও আকারে রূপান্তর প্রসঙ্গে এই দুই অঞ্চলের ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার কথা প্রয়োজন বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে 'ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন "আফগানিস্তান অতীতে ভারতের অঙ্গ ছিলো, ... তখন সেই ভূভাগ ভারতীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলভুক্ত এবং তার স্থাপত্য-ভাস্কর্য-কারুর চাক্ষুষ পরিচয় নিদর্শন আজও আফগানিস্তানে বর্তমান। আরো কথা এই যে, পরবর্তীকালে গজনীর মাহমুদ, ঘোরীর মহম্মদ প্রমূখের লুণ্ঠন অপহরণে শুধু মণিরত্নাদি নয়, সাংস্কৃতিক নানা উপকরণ এমন কি শিল্পী কারিগর পর্যন্ত ভারত থেকে সে দেশে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।"

Dhaka University Institutional Repository

সরোদ নামের আবির্ভাব নিয়েও কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। যেমন,

১. সরোদ শব্দের মূল উৎপত্তি গ্রিক শব্দ থেকে। প্রখ্যাত সরোদবাদক কেরামতউল্লাহ খান এই মতবাদের সমর্থক।

২. সরোদ একটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ 'সুর' (Melody)। প্রখ্যাত সরোদবাদক আমজাদ আলী খান এই মতের সমর্থক।

৩. ফার্সি শব্দ 'সরোদান' থেকে সরোদ শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ 'গান গাওয়া'।

৪. ফার্সি শব্দ 'শাহরুদ' থেকে সরোদ শব্দের উৎপত্তি। 'রুদ' হচ্ছে পারস্যে প্রচলিত লিউট জাতীয় একটি বাদ্যযন্ত্র। 'শাহ্' অর্থ রাজা। কাজেই 'শাহ্রুদ' অর্থ 'বাদ্যযন্ত্রের রাজা'।

উল্লিখিত মতগুলোর কোনটির পক্ষেই সুস্পষ্ট তথ্য প্রমাণ নাই। কাজেই বিষয়টিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। সরোদের ইতিহাস থেকে অন্তত এটুকু বিষয় স্পষ্ট যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন কাবুলি রবাব ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে এবং তারপর ধীরে ধীরে হিন্দুস্তানী সরোদে রূপান্তরিত হতে থাকে, সে সময়েই সরোদ নামটির প্রচলন শুরু হয়। সময়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কে প্রথম সরোদ নামটির প্রচলন করেন, অথবা কি কারণে 'সরোদ' নামটি নির্বাচন করেন এসব বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে ইতিহাস বিশ্লেষণ করে কয়েকটি বিষয়ে অনুমান গঠন করেছেন ড.এড্রিয়ান ম্যাকনিল। যেমন, ফার্সী ভাষায় সরোদ অর্থ গান গাওয়া। কাজেই ফার্সী সাংগীতিক পরিভাষায় এ শব্দটির প্রচলন বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে বেলুচিস্তানে ছড় দিয়ে বাজানোর এক প্রকার যন্ত্র প্রচলিত ছিলো যার নাম সারোদ এবং সিস্তানে অনুরূপ যন্ত্র প্রচলিত ছিলো যার নাম সরুদ। অবশ্যই এই যন্ত্রগুলোর কাঠামোগত গঠনে কাবুলী রবাবের সাথে ভিন্নতা ছিলো। তবে এই যন্ত্রগুলোও যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহৃত হতো। কেরামতউল্লাহ্ খান এবং আরো অনেকের মতে ভারতবর্ষে যা কাবুলি রবাব নামে পরিচিত ছিলো তা আরো অনেক আগে থেকে আফগানিস্তানে সরোদ নামে পরিচিত ছিলো। উল্লেখ্য যে, পাঠানদের মধ্যে অনেকের নামের শেষাংশে 'সরোদী' নাম যুক্ত হতে দেখা যায়। এরা সরোদ অথবা রবাব বাদকের বংশধর। এ থেকে কেরামতউল্লাহ খানের ধারণার পক্ষে একটি যুক্তি পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে এই সরোদ বলতে বে যন্ত্রকে বোঝায় তা আমাদের পরিচিত সরোদ নয়। আমাদের পরিচিত তুলনামূলক আধুনিক যন্ত্র সরোদকে আলোচনার সুবিধার্থে এখানে 'হিন্দুস্তানী সরোদ' বলে উল্লেখ করা হবে। ড.এড্রিয়ান ম্যাকনিলের অনুসরনে উপসংহারে বলা যায় যে, আধুনিক হিন্দুস্তানী সরোদ আবিস্কারের

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই পাঠানদের মধ্যে সরোদ জাতীয় যন্ত্র বাদনের ঐতিহ্য প্রচলিত ছিলো। এরপর পরিবর্তনের মাধ্যমে যখন হিন্দুস্তানী সরোদের (অর্থাৎ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের কথা বাদ দিয়ে আধুনিক যুগে সরোদ বলতে যে ধরণের যন্ত্রের সাথে আমরা পরিচিত) উদ্ভব হলো, তখন সম্ভবত পাঠানদের সংস্কৃতিতে প্রচলিত 'সরোদ' নামটিই এই আধুনিক যন্ত্রের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিলো। [৭৭]

সরোদের উদ্ভাবন ঃ

পশ্‌তুনিস্তান থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে রবাব চলে আসার পর পাঠান রবাবিয়াদের বাদনরীতিতে ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এমনটি ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অধিকন্তু সেনিয়া রবাবিয়াদের কাছে অনেকে ধ্রুপদী সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে এই প্রভাব আরো গভীর হলো। সেনিয়া রবাবিয়াগণ মূলত সেনিয়া রবাব, বীণ এবং সুরশৃঙ্গার বাজাতেন। পারিবারিকভাবে তাঁদের রীতি ছিলো এই যে, নিজ বংশধর ব্যতীত অন্য কাউকে তাঁরা এই যন্ত্রের শিক্ষা দিতেন না। এমনকি পৌত্রদের শিক্ষা দিলেও দৌহিত্রদের দিতেন না।

পাঠান রবাবিয়াদের মধ্যে যাঁরা প্রতিভাবান ছিলেন তাঁরা তানসেনের বংশের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং অত্যন্ত গুণী শিল্পীদের কাছে ধ্রুপদী শেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তবে তাঁরা শিক্ষালাভ করতেন তাঁদের নিজেদের যন্ত্রে অর্থাৎ আফগানী রবাবের সাহায্যে। হিন্দুস্তানী ধ্রুপদী সংগীত শিক্ষালাভের এক পর্যায়ে তাঁরা অনুভব করতে লাগলেন যে ধ্রুপদী সংগীতের যে বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য তা প্রকাশ করার জন্য আফগানী রবাব যথেষ্ট নয়। ক্রমে তাঁদের মধ্যে নতুন কোন যন্ত্র আবিস্কারের চাহিদা সৃষ্টি হতে লাগলো। প্রখ্যাত সরোদিয়া বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত কোলকাতা দূরদর্শনে (১৯৮২) বলেছিলেন যে, "এই রবাবিয়াগন নিজেদের যন্ত্রের দিকে চেয়ে কিছু একটা অভাব বোধ করলেন"।[৭৮] এই অভাব বোধই ক্রমান্বয়ে ইতিহাসকে সরোদ উদ্ভাবনের পথে নিয়ে গেল।

ভারতে বসতি স্থাপনকারী পাঠান বংশোদ্ভূত রবাবিয়াদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ লখনৌ এবং রামপুরে রাজদরবারের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন। গোয়ালিয়র এবং দারভাঙার দরবারেও অনেকে স্থান লাভ করেছিলেন। এভাবে রাজন্যবর্গের এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর পৃষ্টপোষকতায় অনেক রবাবিয়া সংগীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যেই এক বা একাধিক শিল্পী রবাবের পরিবর্তন সাধনে তথা

Dhaka University Institutional Repository

সরোদ উদ্ভাবনে অবদান রাখেন। সরোদ উদ্ভাবনের দাবীদার হিসেবে তিনজনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই তিনজন হলেন – নিয়ামতউল্লাহ খান, গোলাম আলী খান এবং আবিদ আলী খান। পৃথক পৃথকভাবে তিনজনই সরোদ আবিস্কার করেছেন বলে তাঁদের বংশধরেরা দাবী করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এর স্বপক্ষে তথ্য প্রমাণও রয়েছে। তিনজনের ইতিহাস তাই এখানে পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১) নিয়ামতউল্লাহ খান

নিয়ামতউল্লাহ খানের জন্ম ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি পাঠান বংশোদ্ভূত প্রখ্যাত রবাবিয়া করিমউল্লাহ খানের পৌত্র। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে যখন নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহ্ লখনৌ থেকৈ রাজ্যচ্যুত এবং নির্বাসিত হয়ে কোলকাতার মেটিয়াবুরুজে চলে আসেন, তখন তাঁর মেটিয়াবুরুজের সভায় একজন সংগীতজ্ঞ ছিলেন নিয়ামতউল্লাহ খান। সেখানে তিনি এগার বছর ছিলেন। তবে সম্ভবত এর আগে লখনৌ থাকাকালীন তিনি সেখানকার রাজসভায়ও নিয়োজিত ছিলেন। সেই সময়ে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তিনি সরোদ যন্ত্রটি আবিস্কার করেন। তাঁর বংশধরদের কাছ থেকে এই বিবরণ পাওয়া গেছে। তবে প্রকৃতপক্ষে লখনৌয়ের দরবারে থাকার সময়ে অথবা মেটিয়াবুরুজের দরবারে থাকার সময়ে সরোদ আবিস্কৃত হয়েছিলো এ বিষয়ে লিখিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁর সরোদ আবিস্কারের বিষয়ে তথ্য প্রমাণ বিদ্যমাণ।

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত নিয়ামতউল্লাহ খানের পুত্র কেরামতউল্লাহ খানের লেখা 'ইসরার-ই-কেরামত উরফ্ নাগমাত-ই-নিয়ামত' গ্রন্থে কেরামতউল্লাহ এই দাবী লিপিবদ্ধ করেন। তিনি লিখেছেন যে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে (হিসেব করলে তা ১৮৫০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ের কথা বোঝায়) তাঁর পিতা সরোদ যন্ত্রটি আবিস্কার করেছেন। নিয়ামতউল্লাহ খানের প্রপৌত্র মুহম্মদ ইরফান খানের ভাষ্যমতে তানসেন বংশীয় শিল্পী বাসত খানের পরামর্শে নিয়ামতউল্লাহ খান সরোদে কাঠের ফিংগারবোর্ড পরিবর্তন করে ধাতুর তৈরি ফিংগারবোর্ডের প্রচলন করেন এবং অন্ত্রী তারের পরিবর্তে ধাতব তারের প্রচলন করেন। নিয়ামতউল্লাহ খানের অপর একজন বংশধর গুলফাম আহমেদ খানের কছে থেকে নিম্নরূপ ভাষ্য পাওয়া যায় ঃ

" নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ্র দরবারে যোগ দেওয়ার পর নিয়ামতউল্লাহ খান মিঞা তানসেনের পৌত্র বাসত খানের শিষ্য হন। শিক্ষা গ্রহণকালে তিনি তাঁর যন্ত্রে কিছু পরিবর্তন আনয়নের জন্য গুরুর অনুমতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা করেন, কারণ তাঁর যন্ত্রে 'সুত' এবং 'মীড়' ভালভাবে বাজানো যেত না। গুরু তাঁকে অনুমতি দিলেন। নিয়ামতউল্লাহ খান একজন কামারের সাহায্য নিয়ে কাঠের পরিবর্তে একটি পাতলা লোহার পাত লাগালেন। এরপর তাতে লোহা, পিতল এবং ব্রোঞ্জের তার সংযোজন করলেন। এতে করে যন্ত্রটির আওয়াজ, স্বরের গভীরতা এবং স্থায়ীত্ব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি গভীরভাবে তাঁর সরোদে রেওয়াজ করতে লাগলেন। তাঁর গুরু বাসত খান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌র সামনে এই যন্ত্র বাজিয়ে শোনাতে বললেন। নওয়াব তার সরোদ বাদন শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে 'সরকার' উপাধি দিলেন।"

নিয়ামতউল্লাহ খান আরো একটি পরিবর্তন সাধন করেন সরোদে। তখনকার দিনে রবাব যন্ত্রে অস্ত্রী তারের তৈরি চারটি পর্দা বাঁধা থাকতো ফিংগারবোর্ডে। নিয়ামতউল্লাহ্‌ খার সেগুলো অপসারণ করেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোন প্রয়োজন ছিলো না বলে তিনি মনে করেন।

নিয়ামতউল্লাহ খানের অপর একজন বংশধর ইলিয়াস খানের মতে সেনিয়া শিল্পীদের কাছে নিয়ামতউল্লাহ খান সেনিয়া রবাবে বাজানো বোলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজগুলো সরোদে খুব ভালভাবে রপ্ত করেন।

২) গোলাম আলী খান ঃ

সরোদ আবিস্কারের দাবীদারদের মধ্যে গোলাম আলী খানের নাম নিয়ে তাঁর বংশধরেরা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সরব। কারণ তাঁর বংশধরদের মধ্যে রয়েছেন আমজাদ আলী খানের মত তারকাখ্যাতিসম্পন্ন সরোদিয়া, প্রচার মাধ্যমে যাঁর বিচরণ উল্লেখ করার মত। তবে গোলাম আলী খানের এই আবিস্কারের কথা কেবল তাঁর বংশধরদের মুখে প্রচারিত ইতিহাস থেকেই জানা যায়। এর পক্ষে কোন লিখিত নিদর্শন নাই। গোলাম আলী খানের জন্মসালও সঠিকভাবে জানা যায় না। এছাড়া কবে তিনি সরোদ আবিস্কার করেছিলেন তাও সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি পাঠানদের বাংগাশ গোত্রীয় গোলাম বন্দেগী খানের পুত্র ছিলেন। গোলাম বন্দেগী খান ছিলেন রেওয়ার মহারাজা বিশ্বনাথ সিং-এর সেনাবাহিনীর রিসালদার। বাল্যবয়সে পিতার কাছে গোলাম আলী খানের সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। সংগীতে গোলাম আলী খানের আগ্রহের কথা শুনে রেওয়ার মহারাজা নিজে তাঁকে সংগীত শিক্ষা দিতে শুরু করেন তাঁর দশ বছর বয়সে। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি ভ্রমণে বের হন এবং সম্ভবত বিভিন্ন রাজদরবারে গমন করেন। ধারণা করা হয় তিনি ফররুখাবাদের নবাবের দরবারে কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। সেখানে তিনি তানসেনের বংশধর পেয়ার খানের সাহচর্যে আসেন। তিনি শেষ জীবন গোয়ালিয়রে অতিবাহিত করেন এবং ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।

নিয়ামতউল্লাহ খান যে সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরোদ আবিস্কার করেন, গোলাম আলী খানও সেই সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরোদ আবিস্কার করেন বলে জনশ্রুতি আছে।

৩) আবিদ আলী খান ঃ

আবিদ আলী পাঠান বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে দিল্লীতে সম্রাট বাহাদুর শাহের সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। আবিদ আলী খান ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে রামপুরে একজন বিখ্যাত সরোদিয়া হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তানসেন বংশীয় শিল্পী বাহাদুর হোসেন খানের কাছে রামপুরে সংগীত শিক্ষা করেন। ড.এড্রিয়ান ম্যাকনিলের সঙ্গে ১৯৮৬ সালে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর পৌত্র মোহাম্মদ আলী খান বলেন, আবিদ আলী খান কাবুলি রবাব এবং সরোদ দু'টি যন্ত্রই বাজাতেন। তাঁর চাচাতো ভাই মুদ্রু খানও বিখ্যাত সরোদিয়া ছিলেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান এবং ওস্তাদ হাফিজ আলী খানের পূর্বে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত সরোদিয়া। মোহাম্মদ আলী খানের মতে তাঁর পিতামহই সর্বপ্রথম সরোদে ধাতব ফিংগারবোর্ড এবং ধাতব তারের সংযোগ করেন। কবে তিনি এই কাজ করেছিলেন সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট তারিখ মোহাম্মদ আলী খান উল্লেখ করতে পারেন নি, তবে তাঁর ধারণা সম্ভবত ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তিনি এই আবিস্কার করেন। তাঁর এবং তাঁদের বংশের অন্যান্যদেরও বিশ্বাস আবিদ আলী খান সর্বপ্রথম এই আবিস্কার করেন এবং তাঁর অনুকরণে অন্যান্যরাও পরে বাদ্যযন্ত্রে এই পরিবর্তনগুলো আনয়ন করেন। আবিদ আলী খানের পুত্র আহমেদ আলী খানও একজন বিখ্যাত সরোদিয়া ছিলেন। তিনি প্রথমে রামপুরে এবং পরে কোলকাতায় বসবাস করেন।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, এক দিনে অথবা কোন একটি পরিবর্তনের মাধ্যমে সরোদ আবিস্কৃত হয় নি। একটিমাত্র আবিস্কারের পেছনে একাধিক ঘটনা কাজ করে। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

নিয়ামতউল্লাহ খান, গোলাম আলী খান এবং আবিদ আলী খান তিনজনেই কাঠের ফিংগারবোর্ডের পরিবর্তে ধাতব ফিংগারবোর্ড এবং অন্ত্রী তারের পরিবর্তে ধাতব তারের ব্যবহার শুরু করেছিলেন। তবে তাঁদের ব্যবহৃত যন্ত্রগুলো কিন্তু অভিন্ন রকমের ছিলো না। প্রত্যেকের যন্ত্র ভিন্ন রকম ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ামতউল্লাহ্ খান এবং গোলাম আলী খানের পুত্র মুরাদ আলী খানের সরোদ পর্যবেক্ষণ করে গবেষকগন কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। যেমন, সরোদের শেষ প্রান্তে খুঁটি আটকানোর জায়গাটি, ইংরেজিতে যাকে পেগ বক্স বলা হয়, সেটি দু'জনের সরোদে দুই ধরণের ছিলো। নিয়ামতউল্লাহ্ খানের পুত্র কেরামতউল্লাহ্ খানের সরোদ হাতে যে ছবি রয়েছে তাতে দেখা যায় যে, পাঠান সরোদের অনুসরণে এর পেগ বক্সের সামনের অংশ খোলা। সেনিয়া রবাবের গঠনও এই রকম ছিলো। তাঁর পিতা নিয়ামতউল্লাহ্ খানও একই রকম ডিজাইনের সরোদ বাজাতেন।

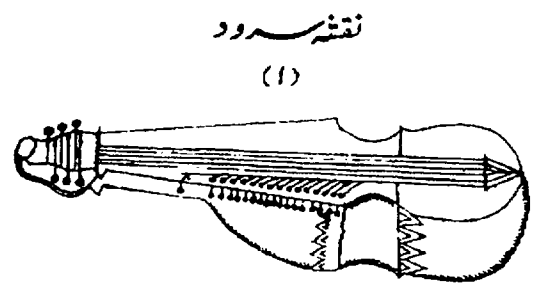

চিত্র-৫২ ঃ নিয়ামতউল্লাহ্ খান এবং চিত্র-৫৩ ঃ নিয়ামতউল্লাহ্ খানের সরোদ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫৪ ঃ সরোদ বাজাচ্ছেন কেরামতউল্লাহ্ খান

অপর দিকে মুরাদ আলী খানের পালিত পুত্র আবদুল্লাহ্ খানের তৈরি সরোদ যা পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র আমির খান বাজিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে পেগ বক্স আবদ্ধ ডিজাইনের এবং এটি বাঁকানো নয়, সোজা। এই ডিজাইনটি সুরশৃঙ্গার এবং বীণের অনুরূপ।

চিত্র-৫৫ ঃ সরোদ বাজাচ্ছেন আমীর খান

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ করতে হয়, এঁদের যার যার গুরুর যন্ত্রের প্রভাব তাঁদের সরোদে লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই সেনিয়া সংগীতজ্ঞদের শিষ্য ছিলেন। নিয়ামতউল্লাহ্ খান বাসত খান এবং কাসিম আলী খানের শিষ্য ছিলেন। এঁদের রবাবের অনুকরণে নিয়ামতউল্লাহ্ খানের সরোদের পেগ বক্স তৈরি হয়েছিলো। মুরাদ আলী খান ছিলেন সেনিয়া সংগীতজ্ঞ বাহাদুর হোসেন খানের ছাত্র, যিনি মূলত সুরশৃঙ্গার বাজাতেন। এই যন্ত্রের অনুকরণে মুরাদ আলী খানের সরোদের পেগবক্স তৈরি হয়েছিলো। তবে পেগ বক্সের ডিজাইনের ভিন্নতা যন্ত্রবাদনে কোন প্রভাব ফেলে না।

কাঠের বদলে ধাতব ফিংগারবোর্ড এবং অন্ত্রী তারের পরিবর্তে ধাতব তারের ব্যবহার যেদিন থেকে শুরু হলো সেদিন থেকেই আধুনিক হিন্দুস্তানী সরোদের জন্ম হলো বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

রবাব থেকে সরোদে রূপান্তরের ফলে আরো দু'টি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় সরোদে, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কাবুলি রবাবে মূল তার দু'টির জায়গায় জোড়ায় জোড়ায় তার ব্যবহার করা হতো। কিন্তু যখন থেকে ধাতব তারের প্রচলন শুরু হলো তখন জোড়া তারের পরিবর্তে মূল তার হিসেবে একটি করে তারের ব্যবহার শুরু হলো। যে কারণে আগে তার মূল ছিলো ছয়টি। কিন্তু নিয়ামতউল্লাহ্ খান এরং গোলাম আলী খান উভয়ের সরোদে মূল তারের সংখ্যা নেমে এলো চারটিতে। সুর ধরে রাখার জন্য (অর্থাৎ ড্রোন হিসেবে, এর অপর নাম শ্রুতি তন্ত্রী) উভয়ে দু'টি করে তার ব্যবহার করতেন। ফলে সরোদের শেষ মাথায় বড় আকারের ছয়টি খুঁটি বা বয়লা আটকানোর ব্যবস্থা করা হলো। এছাড়া নিয়ামতউল্লাহ্ খান একটি চিকারীর তার ব্যবহার করতেন। গোলাম আলী খানের পুত্র মুরাদ আলী খানের সরোদে দু'টি চিকারীর তার দেখা গেছে। চিকারীর তারের খুঁটি নিচের অংশে যেখানে তরফের তারের খুঁটি থাকে তার কাছাকাছি স্থানে লাগানো হতো। যন্ত্রের তারের সাজ ছিলো সেনিয়া বীণকারদের যন্ত্রের অনুরূপ। অর্থাৎ স, প, স, ম।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫৬ ঃ বাদ্যযন্ত্রে জোড়া তার ব্যবহারের নমুনা

দ্বিতীয় পরিবর্তনটি এলো বাদন পদ্ধতিতে। কাঠের ফিংগারবোর্ডে বাঁ হাতের আঙুলের পেছনভাগ অর্থাৎ মাংসল অংশের সাহায্যে তার চেপে ধরে বাজানো হতো। কিন্তু ধাতব ফিংগারবোর্ড লাগানোর পরে তার উপরে তার চেপে রাখার জন্য আঙুলের নখের ব্যবহার শুরু হলো। তর্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকার নখের সাহায্যে প্রয়োজনমত স্থানে তার চেপে ধরে সরোদ বাজতে হয়। এত করে সরোদে স্বরের রেশ অনেক দীর্ঘায়িত হলো। ফলে শুধু আকার বা কাঠামোগত পরিবর্তন নয়, শব্দের গুণ ও মানের দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক বাদ্যযন্ত্রের আবিস্কার হলো।

সুরশৃঙ্গার ও সরোদ ঃ

সুরশৃঙ্গারের সাথে সরোদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। সুরশৃঙ্গারের সাথে সরোদের প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে এবং সরোদ উদ্ভাবনের পেছনে সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রাচীনত্বের বিবেচনায় সুরশৃঙ্গার সরোদরে অগ্রজ। সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের কিছু সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে সরোদে গৃহীত হয়েছে। তবে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের চেয়ে বরং বাদনরীতি এবং তারের বিণ্যাস ও সুর বাঁধার পদ্ধতির দিক থেকে সুরশৃঙ্গার সরোদকে বেশি প্রভাবিত করেছে। প্রাসঙ্গিক কারণে তাই সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫৭ ঃ সুরশৃঙ্গার

সুরশৃঙ্গার আবিস্কারের পেছনের কাহিনী অত্যন্ত চমকপ্রদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই যন্ত্র আবিস্কৃত হয়। মিঞা তানসেনের বংশধর ছজ্জু খানের পুত্র জাফর খান এই যন্ত্রের আবিস্কারক। দু'জনেই খুব উঁদু মাপের রবাব বাদক ছিলেন। একবার জাফর খান এবং নির্মল শাহ্ (মিঞা তানসেনের বংশের প্রসিদ্ধ বীণকার) বেনারসের রাজদরবারে বাদন পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রথমে নির্মল শাহ্ বীণ বাজিয়ে শোনালেন। পরে জাফর খানের বাজাবার পালা। তখন ছিলো বর্ষাকাল। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে জাফর খানের রবাবের চামড়ার ছাউনি এবং অন্ত্রী তার এমনভাবে আর্দ্র হয়ে উঠেছিলো যে তা থেকে ভাল শব্দ উৎপন্ন করা সম্ভব ছিলো না। নির্মল শাহের সাথে জাফর খানের সব সময়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব ছিলো। এ পর্যায়ে এসে আবহাওয়ার কারণে তাঁকে হেরে যেতে হবে মনে করে জাফর খান বেনারসের মহারাজার কাছে এক মাসের ছুটি প্রার্থনা করলেন এবং কথা দিলেন যে এক মাস পর এসে তিনি তাঁর শিল্পকলা প্রদর্শন করবেন। এই এক মাস সময়ের মধ্যে তিনি শহরে গিয়ে একজন কারিগরের সাহায্যে রবাবের মত করে নতুন একটি যন্ত্র তৈরি করলেন। [৭৯]

যে পরিবর্তনগুলো তিনি আনয়ন করেছিলেন তাঁর যন্ত্রে তা হলো, ফিংগারবোর্ড হিসেবে তিনি বড় একটি ধাতব পাত বসালেন। অন্ত্রী তারগুলো খুলে সেখানে ধাতব তার লাগালেন। কাঠের যে শব্দ প্রকোষ্ঠ ছিলো রবাবে তার পরিবর্তে বড় লাউয়ের তৈরি একটি তুম্বা সংযোজন করলেন শব্দপ্রকোষ্ঠ হিসেবে। এই লাউয়ের উপরিভাগে পাতলা কাঠের একটি আচ্ছাদন ছিলো। এর যে ব্রিজ ব্যবহার করা হলো তা ছিলো জওয়ারি ধরণের অর্থাৎ চওড়া চৌকির মত, সরোদ কিংবা বেহালার মত পাতলা ব্রিজ নয়। এর শব্দ অনেকটা সুরবাহারের মত ছিলো। সুরবাহারের মতই ডান হাতে মিজরাব পরে এই যন্ত্র বাজানো হতো।

Dhaka University Institutional Repository

সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের পেগবক্স ছিলো বীণের মত আবদ্ধ ডিজাইনের। এর এক পাশে চারটি অপর পাশে পাঁচটি, এভাবে খুঁটিগুলো লাগানো হতো। এর সুর মেলানের পদ্ধতি সেনিয়া রবাবের মত ছিলো। তবে রবাবের চেয়ে এতে অতিরিক্ত তিনটি তার ব্যবহার করা হলো। দু'টি চিকারীর তার হিসেবে এবং একটি সুর ধরে রাখার জন্য(ড্রোন হিসেবে)। চিকারীর তার লাগানো হলো ঝালা বাজানোর জন্য। ঝালা পূর্বে শুধু বীণ অঙ্গের কাজ ছিলো। তবে জাফর খান নির্মল শাহের শিষ্য ছিলেন। সেজন্য বীণ অঙ্গের বহু কাজ তাঁর জানা ছিলো।

শব্দ প্রকোষ্ঠ হিসেবে একটি তুম্বার ব্যবহার ছাড়াও ছোট আকারের আরেকটি তুম্বা যন্ত্রের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি পেছন দিকে লাগানো হতো অনুনাদক হিসেবে, ঠিক যেমন সুরবাহারে লাগানো হয়। বাদকের পছন্দ অনুযায়ী সেতারেও এই ধরণের ছোট তুম্বা ব্যবহৃত হয়।

জাফর খান তাঁর নতুন যন্ত্রের নামকরণ করেন সুরশৃঙ্গার। অচিরে এই যন্ত্র অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। জাফর খান, তাঁর ভাই পেয়ার খান এবং অপর ভাই বাসিত খানের পুত্র বাহাদুর হোসেন খান উচ্চমানের সুরশৃঙ্গার বাদক ছিলেন। বাহাদুর হোসেন খান তাঁর পালিত পুত্র ওয়াজির খানকে রবাব এবং সুরশৃঙ্গার শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান এবং ওস্তাদ হাফিজ আলী খান ওস্তাদ ওয়াজির খানের কাছে সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে তালিম গ্রহণ করেন। [৮০]

বিবর্তনের ধারায় আধুনিক সরোদ ঃ

সরোদ যন্ত্রটির ইতিহাসের সাথে আফগানিস্তানের পাঠানদের একটি ঐতিহাসিক সম্পৃক্ততা রয়েছে। কারণ সরোদের ইতিহাসের সাথে কাবুলী রবাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই রবাব আফগান যোদ্ধাদের হাতে করেই উপমহাদেশের মাটিতে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীকালে রবাব এবং সরোদ বাদনে পাঠান বংশোদ্ভুত শিল্পীদের ব্যাপক অবদানও রয়েছে। আফগানী রবাব এবং সরোদের সম্পর্কের বিষয়ে ই.এস পেরেরার মতামত অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, কাবুলি রবাব বাদকগন উপমহাদেশে স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। তারা এদেশে প্রচলিত সেনিয়া বাদকদের বাদনরীতি দ্বারা অনুপ্রালিত বোধ করে। সেই কারণে তারা তাদের যন্ত্রের রূপ এবং শব্দের গুণ পরিবর্তিত করতে এবং

Dhaka University Institutional Repository

সেনিয়া রবাবের মত উন্নত মানের শব্দ এবং বাদন পরিবেশনা আয়ত্ব করতে উৎসাহী হয়। এই বিষয়গুলোই তাদেরকে সঙ্গে আনা যন্ত্রটিতে পরিবর্তন সাধন করতে উৎসাহিত করে। [৮১]

পাঠান বংশোদ্ভূত কাবুলী রবাব বাদকদেরা ভারতবর্ষে মূলত অভিবাসী ছিলেন, যার ফলে এদেশের রাজন্যবর্গের পৃষ্টপোষকতা তাঁদের ভাগ্যে জোটে নি, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে যাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তিও কম ছিলো। তাঁরা হিন্দুস্তানে এসে ধ্রুপদী সংগীত শিক্ষা লাভ করেছেন, অথচ তাঁদের কাবুলি রবাবে এই সংগীত ধারণ করতে গিয়ে বারবার বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। [৮২]

হিন্দুস্তানী সরোদ আবিস্কারের পর এই বাধা অনেকাংশে দূর হলো এবং পাঠান বংশোদ্ভূত সরোদিয়াগন হিন্দুস্তানী সংগীতের মূলধারায় চলে এলেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্তানী সরোদ আবিস্কারের আগে থেকেই তাঁরা সেনিয়া সংগীতজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্তানী ধ্রুপদ সংগীতে দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বাদ্যযন্ত্রের সীমাবদ্ধতা তাঁদের দক্ষতা বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো বারবার। হিন্দুস্তানী সরোদ আবিস্কারের পর সেই বাধা অপসারিত হলো প্রায় সম্পূর্ণভাবে। তারপরও বাধা সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে – একথা বলার সময় কিন্তু তখনো আসে নি।

যে আকাঙ্খা পরিপূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠান বংশোদ্ভূত সরোদিয়াগন দিনের পর দিন আবিস্কারের নেশায় মেতে উঠেছিলেন অর্থাৎ সেনিয়া শিল্পীদের ধ্রুপদ অঙ্গের বাদনকৌশল ফুটিয়ে তোলা, সেই উদ্দেশ্য পরিপূরণে অভাবিত সাফল্য লাভের পরও তা শতভাগ পরিপূর্ণ হয় নি তখনও, আধুনিক হিন্দুস্তানী সরোদ আবিস্কারের পরও। ধ্রুপদী ধারার সংগীত সাধনায় ব্রতী এমন কিছু শিল্পী এবং সংগীত সাধক এর পরও অক্লান্তভাবে অনুসন্ধান করে গেছেন সেনিয়া রবাবের উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে বের করতে। সংগীতের ইতিহাসের এই অভিযান সমাপ্ত হয় বাংলাদেশের সন্তান ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান এবং ওস্তাদ আয়েত আলী খানের সফল গবেষণার মাধ্যমে সরোদের সর্বাধুনিক এবং উন্নততর সংস্করণ আবিস্কারের পর। সেনিয়া রবাবে দ্বাদশ অঙ্গের আলাপচারী থেকে ধ্রুপদী যত প্রকার কলাকৌশল পরিবেশন করা যায় তা সাফল্যজনকভাবে পরিবেশনের উপযোগী হলো দুই ভাইয়ের আবিস্কৃত এই পরিশীলিত সরোদ।

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান শুধু যে একজন খ্যাতিমান বাদক ছিলেন তা নয়, একই সাথে তিনি ছিলেন বাদ্যযন্ত্রের একজন গবেষক। সরোদ যন্ত্রের আধুনিকায়নে তিনি সুদীর্ঘ গবেষনা করেছেন। তাঁর এই গবেষনাকার্যে একনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন তাঁরই ছোট ভাই আরেকজন গুণী শিল্পী, সুরবাহার বাদক এবং সেইসাথে একজন দক্ষ বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা ওস্তাদ আয়েত আলী খান। আকৃতি পরিবর্তন এবং তারের পরিবর্তনের মাধ্যমে এই দুই ভাই সরোদ যন্ত্রের শব্দের গুণগত মানে এমন উৎকর্ষ সাধন করেন যার ফলে আগের যে কোন সময়ের চেয়ে তা গুণে মানে অনেক উন্নত হলো এবং বলা যায় এ সময় থেকেই সরোদের সাহায্যে বিশ্বজয়ের সূচনা হলো।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান সরোদে পরিবর্তন আনয়নের আগে সরোদের খোল ছিলো মাত্র নয় ইঞ্চি, ফিংগারবোর্ড ছোট এবং সরু ছিলো এবং গলার অংশ ছিলো মোটা। খোলে গায়ে খুব গভীর করে কাটা ছিলো। তারের সংখ্যা কম ছিলো, তার মেলানোর পদ্ধতিও আলাদা ছিলো, সবচেয়ে আসল কথা তারে শব্দের রেশ ছিলো ক্ষণস্থায়ী।

সেনিয়া ঘরানার ধ্রুপদ অঙ্গের বাদন পদ্ধতিতে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। সেইসাথে কণ্ঠ সংগীত এবং বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিলো। যার ফলে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তৎতালীন সরোদ যন্ত্রের প্রচলিত দৈর্ঘ্য প্রস্থের ফলে এর এমন কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যার কারণে এতে ধ্রুপদ অঙ্গের কাজগুলো সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। তিনি ও তাঁর ভাই দু'জনে গবেষণা করে প্রথমে এর খোলটিকে আরো প্রসারিত এবং গোলাকার করে তৈরি করলেন। তৎকালীন সরোদে নয়টি তরফের তার ছিলো। তাঁরা আরো ছয়টি তরফের তার এর সাথে সংযুক্ত করলেন। ফলে তরফের তারের মোট সংখ্যা দাঁড়ালো পনেরোতে। চিকারীর তারের সংখ্যা একটি বৃদ্ধি করলেন। সুর ধরে রাখার জন্য চারটি তার সংযোগ করলেন। এগুলো ড্রোন হিসেবে কাজ করা শুরু করল। অর্থাৎ সরোদের মধ্যেই তানপুরার আবহ সৃষ্টি হলো। এই চারটি তার লাগানোর জন্য ফিংগার বোর্ডের শেষ মাথায় মেরুর ঠিক নিচে ছোট আকারের আরেকটি পৃথক জওয়ারি লাগানো হলো। এছাড়া ফিংগারবোর্ডের শেষ প্রান্তের কাছে খুঁটি লাগাবার জায়গার পেছন দিকে তাঁরা পিতলের একটি ছোট আকারের অনুনাদক বা তুম্বা সংযুক্ত করলেন। টেলপিস অর্থাৎ তার লাগানোর অংশটিকে নতুন আকৃতিতে তৈরি করলেন, যাতে মূল তার লাগাতে অসুবিধা না হয়। আগের টেলপিস ছিলো অনেকটা পেরেকের মত। নতুন টেলপিস অনেকটা

Dhaka University Institutional Repository

প্রসারিত এবং পাতলা হলো। এই সকল পরিবর্তনের পেছনে সেনিয়া রবাব এবং সুরশৃঙ্গারের প্রভাব সার্থকভাবে কাজ করেছিলো। [৮৩]

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে সরোদে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। [৮৪]

পরিবর্তিত এবং উন্নততর এই সরোদের শব্দ আগের চেয়ে অনেক উন্নত হলো। আওয়াজ গভীর এবং জোরালো হলো এবং এর রেশও অনেক দীর্ঘস্থায়ী হলো। এর সুর প্রতিধ্বনিত হওয়ার ক্ষমতা, যাকে ইংরেজিতে Reverberate বলা হয়, তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। এই সমগ্র গুণাবলির কারণে যন্ত্রটি বীনে বাজানোর মত আলাপচারীর সকল অঙ্গ পরিবেশনের যোগ্যতা অর্জন করল। পরিবর্তন সাধনের আগে সরোদে শুধু দ্রুত গৎ বাজনো হতো। মীড় বাজানো গেলেও মীড়ের স্থায়ীত্ব কম ছিলো। যে কারণে ধ্রুপদী শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা সরোদে গৎ বাজানোর আগে সুরশৃঙ্গার যন্ত্র নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলাপচারীর কাজ পরিবেশন করতেন। ঠিক যেমনভাবে আগেকার দিনে সেতারে গৎ বাজানোর আগে সুরবাহারে আলাপ বাজানোর প্রথা প্রচলিত ছিলো।

সঙ্গত কারণেই সরোদের নতুন সংস্করণ দ্রুত সমগ্র উপমহাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করল। ওস্তাদ আয়েত আলী খান নিজ হাতে নতুন সংস্করণের একটি সরোদ তৈরি করে ভ্রাতস্পুত্র ওস্তাদ আলী খানের বিয়েতে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। কোলকাতার প্রখ্যাত সরোদ নির্মাতা হেমেন সেন এই সরোদটিকে মডেল হিসেবে নিয়ে এর মাপজোখ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করে রাখেন এবং পরে সেই মাপ অনুযায়ী সরোদ তৈরি করে সমগ্র উপমহাদেশে এমনকি উপমহাদেশের বাইরেও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। [৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

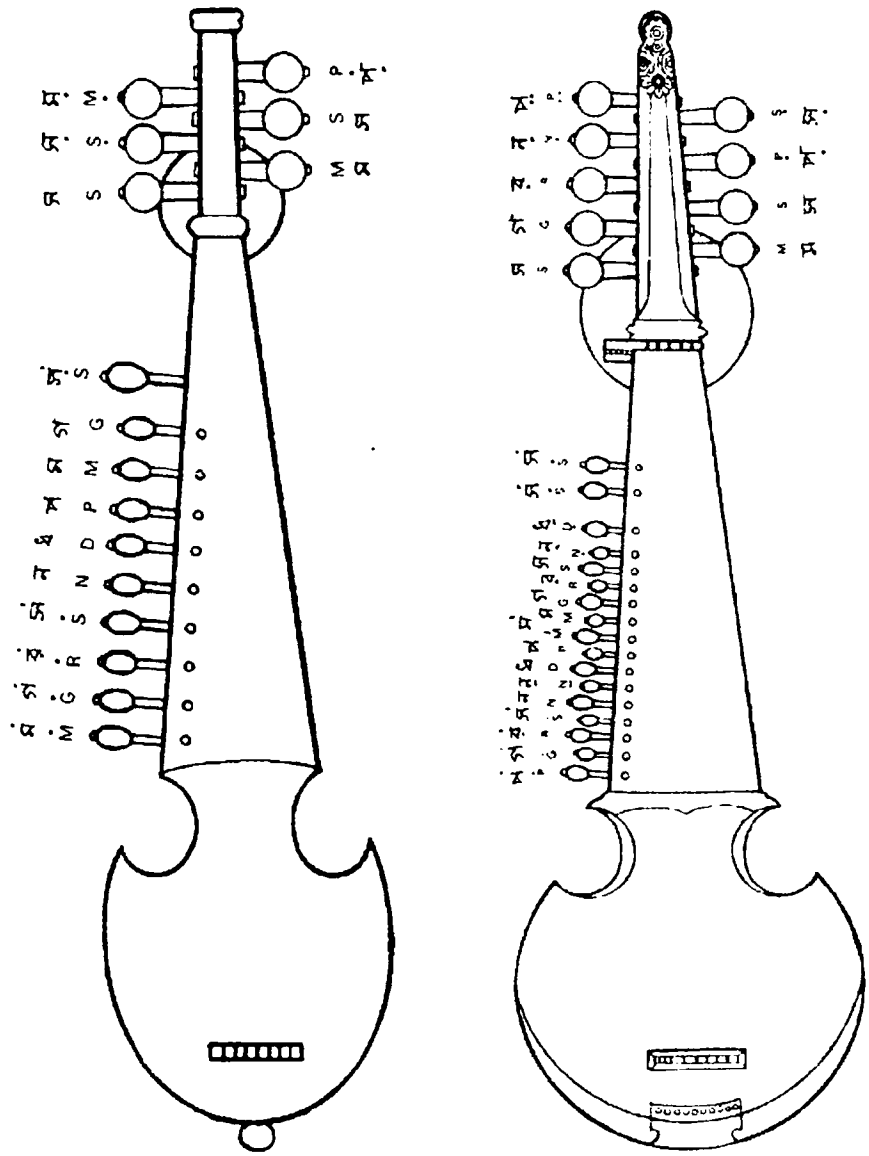

চিত্র-৫৮ ঃ প্রাচীন এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের পরিমার্জিত সরোদের তুলনামূলক চিত্র

প্রচলিত ছড় দিয়ে বাজানোর যন্ত্র ঃ সারেঙ্গী, তাউস, দিলরুবা ও এস্রাজ

উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে পশ্চিমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের পাহাড়ী অঞ্চল এবং অপরদিকে পূর্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উপমহাদেশীয় অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল থেকে ছড় দিয়ে বাজানোর নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন চলে এসেছে। এ সমস্ত অঞ্চলের লোক সংগীতে, অথবা যে সব এলাকা পাহাড়ী, সেখানকার পাহাড়ী গোত্রে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের গানের সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে এ ধরণের

Dhaka University Institutional Repository

ধনুর্যন্ত্রই সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। ধারণা করা হয় ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন যন্ত্রটি ছিলো ধনুর্যন্ত্র। রাবনাস্ত্র অথবা রাবনহস্ত বীণা অথবা রাবণহাতি বীণা নামে অত্যন্ত প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই। এটি ছিলো প্রথম যুগের বাদ্যযন্ত্র। কারো কারো মতে এটিই প্রথম বাদ্যযন্ত্র, ধনুকের টঙ্কার শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে রাবন এই বাদ্যযন্ত্র আবিস্কার করেছিলেন। প্রাচীন রাবনহস্ত বীণার সাথে সারেঙ্গীর বিবর্তনমূলক সম্পর্ক কতখানি তা গবেষণা সাপেক্ষ বিষয়। তবে ধনুর্যন্ত্র হিসেবে রাবনহস্ত বীণা, সারেঙ্গী, এস্রাজ সবই একটি বৃহত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে সাধারণ বিষয় হচ্ছে এগুলো ছড় দিয়ে বাজানো হয়। ছড় দিয়ে বাজানোর কারণে এ যন্ত্রে টানা সুরের সৃষ্টি হয় যা অনেকটা মানুষের কণ্ঠের অনুরূপ। মানুষের কণ্ঠের অনুরূপ হওয়ার কারণেই সম্ভবত বিভিন্ন অঞ্চলে কণ্ঠসংগীতের সহযোগী যন্ত্র হিসেবে এই জাতীয় যন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড় দিয়ে টানা বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন বেশি, তাই কখন থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে ধনুর্যন্ত্রের প্রচলন হলো তার সুস্পষ্ট লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বর্তমানে প্রচলিত ধনুর্যন্ত্রগুলোর মধ্যে সারেঙ্গী সবচেয়ে প্রাচীন। কিন্তু ঠিক কবে এর উৎপত্তি সঠিকভাবে বলা যায় না।

সারেঙ্গী যন্ত্রের নাম উল্লেখ না করে যদি সামগ্রিকভাবে আমরা ধনুর্যন্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করি, তাহলে প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বিভিন্ন গুহাচিত্র, রিলিফচিত্র ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীত প্রাপ্ত এইসব শিল্পকর্মে ধনুর্যন্ত্রের চিত্র পাওয়া গেছে। যেমন অন্ধ্রের বিজয়বাড়া ও মহীশূরের অর্কেশ্বর মন্দির। সারিন্দা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র পশ্চিম বাংলার বিষ্ণুপুরে এবং সারেঙ্গী ধরনের যন্ত্র পশ্চিম ভারতের কয়েকটি মন্দিরের ভাস্কর্যে দেখা যায়। এইসব প্রমাণ থেকে অনায়াসে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এ অঞ্চলে প্রায় এগারশ বছর ধরে ছড়ে টানা বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন রয়েছে। [৮৬]

আধুনিক যুগে প্রচলিত পশ্চিমা যন্ত্র বেহালাও এ জাতীয় যন্ত্র। পশ্চিমা জগত থেকে বেহালার আগমন হলেও উপমহাদেশে প্রচলিত ধনুর্যন্ত্রের মধ্যেই বেহালার উৎপত্তির মূল নিহিত রয়েছে বলে অধিকাংশ মনিষীরা একমত। বি.সি. দেবের মতে সমগ্র উপমহাদেশে এমন কোন অঞ্চল নাই যেখানে বেহালা জাতীয় যন্ত্রের প্রচলন নাই। গুজরাট, রাজস্থান এবং পশ্চিম ভারতের কোন কোন স্থানে রাবনহস্ত বীণা নামে যে সুপ্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রচলন আজও কমবেশি রয়ে গেছে। নারকেলের মালা দিয়ে এর শব্দ প্রকোষ্ঠ তৈরি হয়। নারকেলের মালা কেটে মুখটা চামড়া দিয়ে ছাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সঙ্গে একটি সরু বাঁশের দণ্ড লাগানো হয়। দু'টি তার থাকে যন্ত্রে, সেগুলো থেকে ছড়ের সাহায্যে স্বর উৎপন্ন করা হয়। [৮৭]

চিত্র-৫৯ ঃ রাবনহস্ত বীণা

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত চিত্রে রাবনহস্ত বীণার খোলটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তবে ছড়টি বেশ বড় বলে চোখে পড়ে। ছড়ে ঘুঙুর লাগানো থাকে, ছড় টানার সময় টুন টুন করে শব্দ সৃষ্টি করে। ছড়ের একটি স্কেচ নিচে দেওয়া হলো।

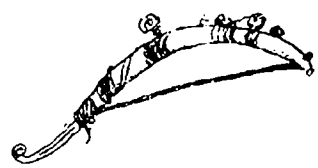

চিত্র-৬০ ঃ রাবনহস্ত বীণার ছড়

অন্ধ্রে ও মহারাষ্ট্রে এর কাছাকাছি ধরণের যন্ত্র 'কিংরি' এবং মণিপুরে 'পেনা' এবং উড়িষ্যায় 'বনম' প্রচলিত।

বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এ ধরণের যে লোক যন্ত্রটি প্রচলিত তার নাম হচ্ছে সারিন্দা। সারিন্দার আকার একটু বিশেষ ধরণের। বেশিরভাগ যন্ত্রের শব্দ প্রকোষ্ঠ গোল বা লম্বাটে গোল ধরণের হয়ে থাকলেও এর শব্দ প্রকোষ্ঠের দুই পাশ এত গভীর করে কাটা যে গোল অকারের কোন প্রভাব সহজে বোঝা যায় না। এই গভীর খাঁজ কাটার কারণে নিচের অংশ সরু দেখায়, তুলনামূলকভাবে উপরের অংশ প্রশস্ত। [৮৮] দেখতে অনেকটা পাখির আকারের মত মনে হয়। নিচের অংশটিতে চামড়ার ছাউনি থাকে, উপরের অংশ অনাবৃত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

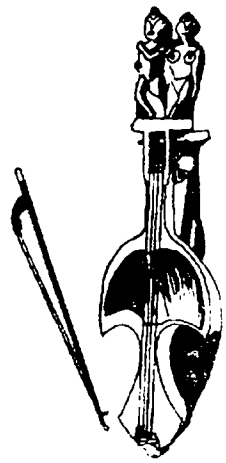

চিত্র-৬১ ঃ সারিন্দা

বাংলাদেশে আরো সহজ এবং সুপ্রচলিত আরেকটি যন্ত্র ছোট আকারের মাটির খোল দিয়ে তৈরি এক তারের সারিন্দা। খেলনা হিসেবে শিশুদের কাছে এর জনপ্রিয়তা খুব বেশি এবং এটি মেলায় বেশি বিক্রী হয়।

চিত্র-৬২ ঃ সারিন্দার অনুরূপ লোকজ বাদ্যযন্ত্র

ছড় টানা বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দু'টি শ্রেণী আছে। একটি শ্রেণীতে বাজানোর সময়ে শব্দ প্রকোষ্ঠ বা খোলের মত অংশ উপরের দিকে থাকে। যেমন, বেহালা, রাবনহস্ত বীণা, বনম ইত্যাদি। অন্য শ্রেণীতে শব্দ প্রকোষ্ঠ নিচে থাকে। যেমন, সারেঙ্গী, সারিন্দা, এস্রাজ, দিলরুবা ইত্যাদি।

পরিশেষে এই গোত্রের মধ্যে উচ্চাঙ্গ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে যা প্রথম মর্যাদা পেয়েছে সেই যন্ত্র অর্থাৎ সারেঙ্গি প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসব। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকজ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সারেঙ্গীর প্রচলন যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, দরবারে এর স্থান হয়েছে অনেক পরে। রাজদরবারের সংস্পর্শের বাইরে

Dhaka University Institutional Repository

থাকায় রাজন্যবর্গের ইতিহাস গ্রন্থে প্রাচীনকালে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ কারণেই, জোয়েপ বোর বলেছেন, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে সারেঙ্গী যন্ত্র সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। [৮৯]

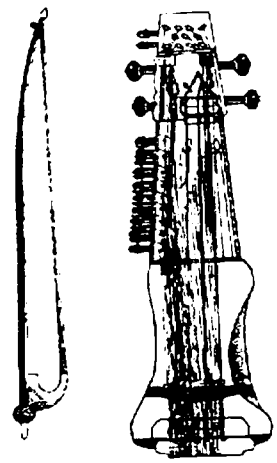

চিত্র-৬৩ ঃ সারেঙ্গী

জোয়েপ বোর আরো বলেছেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করার দু'শ বছর আগেও সারেঙ্গী অত্যন্ত জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিলো। প্রাকৃত ভাষায় রচিত জৈন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কাহিনীতে এর যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ১০৫২ খ্রিষ্টাব্দে জ্ঞানেশ্বরসুরী রচিত "কথাকোষপ্রকরণ" গ্রন্থে একে তত জাতীয় যন্ত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাকৃত সাধারণ মানুষের ভাষা হিসেবে পরিগণিত। তাই ধারণা করে নেওয়া যায় সাধারণ মানুষের কাছে লোক এবং ধর্মীয় সংগীতের অনুষঙ্গ হিসেবে যন্ত্রটি প্রচলিত ছিলো। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামের আঞ্চলিক ধরণের সারেঙ্গীর কথা শোনা যায়। যেমন, যোগিয়া সারেঙ্গী, সিন্ধী সারেঙ্গী, ধানী সারেঙ্গী, গুজরাতান সারেঙ্গী, পাইলেদার সারেঙ্গী ইত্যাদি।

উচ্চাঙ্গ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে সারেঙ্গীর ব্যবহার শুরু হয়। ধ্রুপদী সংগীতের পরে খেয়ালের প্রচলন যখন থেকে শুরু হলো তখন সাথে সারেঙ্গীর প্রচলন হয়। পূর্ববর্তী যুগে ধ্রুপদী সংগীতের সাথে বীণার সাহায্যে সংগত করা হতো। কিন্তু খেয়াল প্রচলনের পর এর সাথে সংগত করার জন্য নতুন কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কারণ খেয়ালের স্টাইলের সাথে বীণার স্টাইল মানানসই ছিলো না। এর আগে নর্তকীদের নৃত্য ও গীতের সাথে সারেঙ্গীর সাহায্যে সংগত করার প্রচলন ছিলো। তখনই সংগীতজ্ঞদের নজরে আসে যে, কণ্ঠসংগীতের সহযোগিতা করার অসাধারণ এক গুণ রয়েছে এই যন্ত্রের। ক্রমে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সহযোগী হিসেবে স্থান করে নেয় সারেঙ্গী। [৯০]

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চাঙ্গ সংগীতের সহযোগী হিসেবে প্রবেশ করার পর প্রায় দুইশ বছর একচেটিয়া রাজত্ব করে সারেঙ্গী। সারেঙ্গীর সাহায্যে কণ্ঠে পরিবেশনের উপযোগী সব ধরণের কাজই বাজানো যায়। খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা অথবা ভজন যাই হোক না কেন, সহযোগী হিসেবে সারেঙ্গী এক কথায় অনন্য। সেই কারণে সারেঙ্গীবাদকেরা উচ্চাঙ্গ সংগীতে পর্যাপ্ত তালিম গ্রহণ করে তবেই সারেঙ্গী বাদন শুরু করেন। প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে ওস্তাদ আবদুল করিম খান, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান এবং ওস্তাদ আমীর খান প্রথম জীবনে সারেঙ্গী বাদক ছিলেন। [৯১]

জোয়েপ বোর সারেঙ্গী বাদনের জন্য দিল্লীর নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ কয়েকটি শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, পানিপাত, সোনিপাত, কিরানা, শাহরানপুর, মুজাফফরনগর, মিরাট, মুরাদাবাদ, বুলান্দশহর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চাঙ্গ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে 'পানিপাত-সোনিপাত' ঘরানার প্রখ্যাত সারেঙ্গী বাদক ওস্তাদ হায়দার বখস-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওস্তাদ হায়দার বখস সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ জাফরের সভা সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি সারেঙ্গীতে আধুনিক এবং পরিশীলিত বাদনরীতির প্রবর্তন করেন এবং একটি সমৃদ্ধ যন্ত্র হিসেবে একে প্রতিষ্ঠা করেন। [৯২]

সারেঙ্গীর আওয়াজ অত্যন্ত সুরেলা এবং সুমিষ্ট। তবে এর আকার একটু বিশেষ ধরণের। অন্যান্য যন্ত্রের মতই এর নিচের অংশটা ফাঁপা একটি প্রকোষ্ঠের মত যাকে শব্দ প্রকোষ্ঠ বলা হয়। অনেকটা চৌকোনা ধরণের, কিন্তু অসমান আকৃতির। মূল কাঠামো আয়াতাকার ধরে নিলে দুই পাশ গভীরভাবে ভেতরের দিকে কেটে নেওয়া হয়েছে। এই গভীরতা দুই পাশে সমান নয়।

সারেঙ্গী সাধারণত দুই থেকে সোয়া দুই ফুট লম্বা হয়ে থাকে, চওড়ায় প্রায় ছয় ইঞ্চির মত এবং চার ইঞ্চির কিছু বেশি পুরু। ওজন প্রায় দুই কেজির মত। তবে কোন মাপই নির্দিষ্ট নয়। সম্ভবত সারেঙ্গীই একমাত্র বাদ্যযন্ত্র যার ক্ষেত্রে শুধু একথা বলা যায় যে, কোন একটি যন্ত্রের সাথে অপর একটি যন্ত্র হুবহু মিলে না। মাপে কিছু না কিছু গরমিল থাকবেই।

সারেঙ্গী তৈরি হয় নিরেট এক খণ্ড কাঠ থেকে। সাধারণত মেহগনি কাঠ এ কাজে ব্যবহৃত হয়, তবে সেগুন কিংবা আম কাঠও ব্যবহৃত হয়। সারেঙ্গীর তিনটি অংশ - পেট, ছাতি এবং মগজ। পেটের অংশ

Dhaka University Institutional Repository

সামনে থেকে খুদে ফাঁপা করা হয়, ছাতি এবং মগজ পেছন থেকে খুদে ফাঁপা করা হয়। পেট অংশটি হচ্ছে এর শব্দপ্রকোষ্ঠ।

সম্পূর্ণ সারেঙ্গীর আকার অনিয়মিত। এমনকি কোমরের অংশের গভীরতাও সমান নয়, ডান দিকের চেয়ে বাম দিক বেশি গভীর। পেট বা শব্দপ্রকোষ্ঠের উপরে ছাগলের চামড়ার ছাউনি দেওয়া থাকে। ছাতির ডান পাশে তিন সারিতে তরফের তারের জন্য ছোট ছোট খুঁটি লাগানো থাকে। তরফের তার পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশটা থাকে। সেই অনুযায়ী খুঁটির সংখ্যাও নির্ধারিত হয়।

সারেঙ্গী বাজানোর জন্য অন্ত্রী তার ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ছাগলের অন্ত্র বা নাড়ী থেকে এই তার তৈরি হয়। মগজ অংশে দুটি বিভাগ থাকে। উপরের অংশে তরফের তারের খুঁটি লাগানো হয়। নিচের অংশে চারটি বড় খুঁটি থাকে, তিনটি মূল তারের জন্য এবং অন্যটি একটি মোটা ধাতব তরফের তারের জন্য। সারেঙ্গীতে তিনটি ব্রিজ ব্যবহৃবত হয়। মূল তারের জন্য একটি ব্রিজ পেট অংশের উপরে চামড়ার তৈরি একটি বেল্ট দিয়ে আটকানো থাকে। অন্য দুটি তরফের তারের জন্য, এগুলো আকারে ছোট এবং চেপ্টা।

সারেঙ্গী বাজানো হয় ছড় দিয়ে। এর ছড়কে গজ বলা হয়। প্রায় বাইশ ইঞ্চি লম্বা পাতলা কাঠের সাথে ঘোড়ার লেজের চুল টান টান করে আটকিয়ে গজ তৈরি করা হয়।

সারেঙ্গীর মত ছড় দিয়ে বাজাতে হয় এমন আরো কয়েকটি যন্ত্রের নাম হলো তাউস, দিলরুবা, এস্রাজ। তবে সারেঙ্গীর সাথে এই তিনটি যন্ত্রের পার্থক্য আছে। তাউস, দিলরুবা এবং এস্রাজের উপরের অংশ সেতারের মত। কিন্তু নিচের অংশ সেতারের মত নয়, সেতারের মত এগুলোর পাতলা কাঠের তবলী নাই। বরং সারেঙ্গীর মত চামড়ার আচ্ছাদন দেওয়া একটি খোল রয়েছে এবং সারেঙ্গীর মতই এই যন্ত্রগুলো ছড় দিয়ে বাজাতে হয়। এই যন্ত্রগুলোকে সেতার এবং সারেঙ্গীর সমন্বয় বলা যেতে পারে।

তিনটি যন্ত্রের মধ্যে তাউস সবচেয়ে প্রাচীন। উনবিংশ শতব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাউস যন্ত্রের আবির্ভাব। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'মাদান-আল-মুসিকী' গ্রন্থে, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর রচিত 'যন্ত্রকোষ' গ্রন্থে এবং ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সাদিক আলী রচিত 'সরমাইয়া-ই-ইসরাত' গ্রন্থে তাউস যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। [৯৩] এই যন্ত্রের উৎপত্তি পাঞ্জাবে। [৯৪]

Dhaka University Institutional Repository

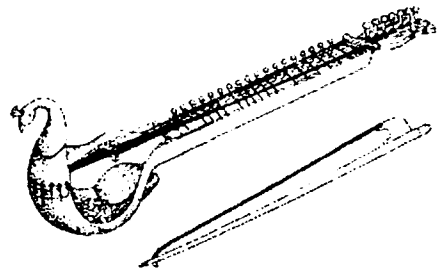

চিত্র-৬৪ ঃ তাউস

তাউস শব্দের অর্থ আরবী এবং ফারসিতে ময়ূর। তাউস যন্ত্রের নিচের অংশ ময়ূরের আকৃতিতে তৈরি। সেইজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে তাউস।

তাউস যন্ত্রের মূল তারের সংখ্যা চারটি, এগুলো ধাতুর তৈরি। তরফের তার সাত, নয় অথবা এগারটি। তরফের তার আটকানোর জন্য এর দণ্ড বরাবর সংযুক্ত আলাদা একটি কাঠের পাত লাগানো হয় এবং এই পাতে খুঁটির সাহায্যে তরফের তার লাগানো হয়। দণ্ডের উপরে ষোলটি পর্দা লাগানো থাকে। [৯৫]

যখন থেকে তাউস যন্ত্রটির প্রচলন হয় তখন থেকেই শিখদের কীর্তনের সঙ্গে সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পাতিয়ালার রাজদরবারের কীর্তন গায়ক কাহান সিং এর আবিস্কর্তা।[৯৬] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত তাউস অত্যন্ত জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিলো।

পাতিয়ালার রাজদরবারে মহন্ত গজ্জা সিং নামে আরো একজন প্রখ্যাত তাউস বাদক ছিলেন। তিনি তাউস যন্ত্রের কিছু পরিবর্তন সাধন করেন এবং এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয় দিলরুবা।[৯৭] তাউসের সাথে দিলরুবার আকারে সামান্য ভিন্নতা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন পার্থক্য নাই। তাউসের শব্দ প্রকোষ্ঠের ময়ূরের মত আকৃতি পরিবর্তন করে সারেঙ্গীর মত চৌকোনা আকার দিয়ে এই নতুন যন্ত্রের নাম দেওয়া হয় দিলরুবা। যন্ত্রের পর্দা, তার ইত্যাদি অপরিবর্তিত রয়ে যায়। তাউসের ময়ূরের মত আকৃতি থাকার কারণে এটি বহন করা এবং স্থানান্তর করা কষ্টসাধ্য ছিলো। এই বিষয়টি দিলরুবা যন্ত্রের আবিস্কারকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবিত করে। দিলরুবা আবিস্কারের পর এটি শিখদের কির্তনের প্রধাণ সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। [৯৮] দিলরুবা অর্থ যা হৃদয় (দিল)কে হরণ করে।

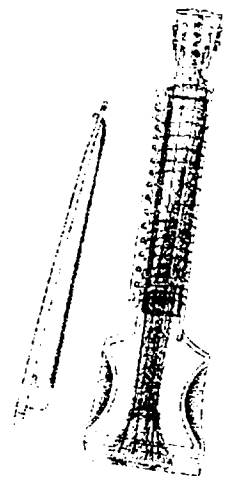

চিত্র-৬৫ ঃ দিলরুবা

তাউসের ময়ূরের মত অংশটি বাদ দিলে বাকী অবয়বের সাথে দিলরুবার কোন পার্থক্য নাই। কাঠের তৈরি খোলটিকে 'পিয়ালা' বলা হয়। এর উপরে ছাগলের চামড়ার ছাউনি দেওয়া থাকে। তাউসের মত দিলরুবায় আঠারটি পর্দা রয়েছে। তারের সংখ্যাও একরকম, সাধারণত নয়টি। তাউস এবং দিলরুবার ছড় গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিকে থেকে অভিন্ন।

সেতার এবং সারেঙ্গীর সমন্বয়ে গঠিত আরেকটি জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র এস্রাজ। বিশেষ করে বাংলাদেশে এর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশি। সৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, মৃদুকণ্ঠী মহিলা কণ্ঠশিল্পীদের গানের সাথে এই যন্ত্র সংগত করা হতো এবং কখনো কখনো এককভাবেও বাজানো হতো। [৯৯]

Dhaka University Institutional Repository

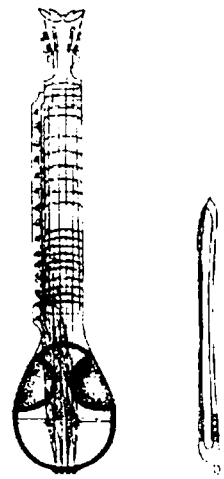

চিত্র-৬৬ ঃ এস্রাজ

স্বামী প্রজ্ঞানানান্দর মতে এস্রাজ যন্ত্রের গঠনে বাঙালী সংগীতজ্ঞদের অবদান রয়েছে। ১৮৫৭ সালে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্ যখন লখনৌ থেকে নির্বাসিত হয়ে কোলকাতার মাটিয়াবুরুজে দরবার স্থাপন করেন তখন তাঁর দরবারের কোন সংগীতজ্ঞের হাতে এস্রাজ বর্তমান রূপ লাভ করে। এরপর সেনিয়া ঘরানার প্রখ্যাত রবাব বাদক বাসত খান সম্ভবত এই যন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে গয়াধামে চলে যান। সেখানে তিনি অনেক শিষ্যকে এস্রাজ যন্ত্রে তালিম দেন। এভাবে সমগ্র বিহারে যন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়ে। [১০০]

এস্রাজ যন্ত্রটি ক্রমান্বয়ে বিষ্ণুপুর ঘরানায় প্রসার লাভ করে। গয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা এবং আসামে যন্ত্রটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখা যায়। এস্রাজ যন্ত্রের প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ দুর্বলতা বাঙালীদের মধ্যে এস্রাজ জনপ্রিয় হওয়ার একটি মূল করাণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই যন্ত্রটিকে খুবই গুরুত্ব দিতেন, যে কারণে রবীন্দ্র সংগীতের সাথে সঙ্গত করার জন্য এস্রাজ রীতিমত একক আধিপত্য নিয়ে বিরাজ করে দীর্ঘদিন। ক্রমে হারমনিয়ামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে এস্রাজের ব্যবহার কিছুটা কমে আসে, তবে এর জনপ্রিয়তা এখনো উল্লেখযোগ্য। শুধু সঙ্গত করার যন্ত্র হিসেবে নয়, একক যন্ত্র হিসেবেও এস্রাজের নিজস্ব একটি অবস্থান গড়ে উঠেছে।

এস্রাজে মূল তারের সংখ্যা চারটি। এছাড়া তরফের তার রয়েছে তরফদার সেতারের মত। তারের সংখ্যা বারো থেকে পনের। ধাতুর তৈরি পর্দা রয়েছে কুড়িটি। [১০১]

Dhaka University Institutional Repository

শিখ কির্তনের সঙ্গে যেমন দিলরুবা তেমনি রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে এস্রাজের ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিলো। । শব্দ এবং বাজানোর কৌশলের দিক থেকে সারেঙ্গীর সাথে মিল থাকলেও পার্থক্য হচ্ছে এস্রাজে সেতারের মত পর্দা বাঁধা রয়েছে, সারেঙ্গীতে তা নাই। তবে বাজানোর কৌশলও একেবারে এক নয়, ভিন্নতা রয়েছে। কারণ এস্রাজ বাঁ হাতের আঙুলের সাহায্যে বাজাতে হয় অনেকটা সেতার বাজানোর সময় যেভাবে আঙুল চালনা করতে হয় সেভাবে। কিন্তু সারেঙ্গী বাজাতে হয় নখের গোড়া দিয়ে। সেতার এবং সারেঙ্গীর সমন্বয়ে এস্রাজ নির্মানের উদ্দেশ্য হয়তো ছিলো সারেঙ্গীর চেয়ে সহজসাধ্য কোন বাদ্যযন্ত্র আবিস্কার করা। [১০২]

দিলরুবা এবং এস্রাজ দু'টি যন্ত্রই একক বাদনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একক বাদনের ক্ষেত্রে সেতার বা সরোদের মত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি এই দু'টি যন্ত্র।

প্রচলিত আনদ্ধ যন্ত্র ঃ তবলা

বর্তমান যুগে উচ্চাঙ্গ সংগীত ও লঘু সংগীত, কণ্ঠ সংগীত এবং যন্ত্র সংগীত যে কোন ধরণের সংগীতের সাথে সবচেয়ে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় তাল যন্ত্র হচ্ছে তবলা বাঁয়া। তবলা-বাঁয়া একে অপরের জুটি। দু'টিতে মিলে তৈরি হয়েছে একটি সম্পূর্ণ বাদ্যযন্ত্র।

তবলা নামের উৎপত্তি আরবী শব্দ তবল থেকে। তাই সাধারণভাবে ধারণা প্রচলিত আছে যে, এই বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তির পেছনে কোন আরব বাদ্যযন্ত্রের প্রভাব রয়েছে। তবে উপমহাদেশে আরবদের আগমণের আরো অনেক আগে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীর ভাস্কর্যে তবলা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেখা যায়। যদিও তবলা নামটি তখন প্রচলিত ছিলো না। তবলা জাতীয় যে বাদ্যযন্ত্রের চিত্র প্রাচীন গুহাচিত্রে দেখা যায় তার নাম ছিলো পুষ্কর। গঠনগত দিক থেকে এবং বাজাবার ধরণের দিক থেকে তবলা বাঁয়ার সাথে এর মিল খুব বেশি। প্রাচীন পুষ্কর থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে তবলা বাঁয়ার উৎপত্তি হয়েছে। [১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস গ্রন্থে পুষ্কর প্রসঙ্গে বলেছেন যে এটি মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। আধুনিক যুগে গানের সাথে যেমন তবলা বাঁয়া ব্যবহার করা হয় প্রাচীন কালে এদেশে তেমনি মৃদঙ্গ ধরণের তিনটি যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। এর মধ্যে দু'টির আকার বড়, এ দু'টি এক সমান। অন্যটি আকারে ছোট। এই বাদ্যযন্ত্রগুলোকে পুষ্কর বলা হতো। পুষ্কর যন্ত্রের বিবরণ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দর ভাষায় দেওয়া হলো –

"বড়ো পুষ্কর দু'টি সোজাভাবে দাঁড় করানো আর ছোটটি শোয়ানো (শায়িত অবস্থায়) থাকত। পাথরের গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্যচিত্রে কখনো কখনো দু'টি পুষ্করের প্রতিকৃতি দেখা যায়। .. .. প্রাচীনকালে তিনটি পুষ্করের মধ্যে বড় দু'টির একটিকে বাম হাতে ও অপরটিকে ডানহাতে এবং ছোটটিকে সম্ভবতঃ উভয় হাত দিয়ে বাজানো হোত। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে ভূবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দিরে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বোম্বাইয়ের বাদামী মন্দিরে ও তাছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরগুলিতে তিনটি পুষ্করের প্রস্তরচিত্র দেখা যায়। .. .. নটরাজের দক্ষিণে নৃত্যশীল গনপতি। গণপতির পাশে একজন বাদক দু'হাতে দু'টি সমান আকারের পুষ্কর বাজাচ্ছে। তার সামনে আর একটি সামান্য ছোট আকারের ছোট মৃদঙ্গ শোয়ানো আছে।" [১০৪]

তিনটি পুষ্করের মধ্যে যেগুলো খাড়াভাবে রেখে বাজানো হতো সেগুলো ছিলো তবলা বাঁয়ার আদি রূপ। যদিও তবলা নামের কোন বাদ্যযন্ত্র সে আমলে ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে তবলা নামের কোন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে। তবলা শব্দটির উৎপত্তি আরবি শব্দ তবল থেকে। আরব দেশে তবল বলতে সমতল উপরিভাগ বিশিষ্ট তালযন্ত্রকে বোঝানো হতো। এই সমতল অংশটা হতো উর্দ্ধমুখী। [১০৫]

উপমহাদেশে আরবদের আগমণের পূর্বে দুন্দুভি, ভেরী, নিশান প্রভৃতি তালযন্ত্রের প্রচলন ছিলো। ঐতিহাসিকদের মতে মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে রণবাদ্য হিসেবে তবল এবং আরো কয়েকটি তালযন্ত্রে এদেশে আসে। যেহেতু আরবদের উর্দ্ধমুখী তালযন্ত্রের নাম ছিলো তবল, সেইহেতু তারা এদেশে প্রচলিত তালযন্ত্রকে একই নামে অভিহিত করল। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাদের তবল যন্ত্রের সাথে হিন্দুস্তানী সংগীতে প্রচলিত তালযন্ত্রের কোন মিল ছিলো না। এছাড়া আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনাকালের পূর্বে এদেশে তবল নামে কোন বাদ্যযন্ত্রের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

পাখওয়াজ কেটে তবলা তৈরি করা হয়েছে, এ ধরণের একটি ধারণাও প্রচলিত রয়েছে। তবে এর স্বপক্ষে কোন লিখিত প্রমাণ নাই। এছাড়া ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে সময় থেকে পাখোয়াজের প্রচলন সে সময়ে তবলাও প্রচলিত ছিলো। একটি থেকে অপরটির উৎপত্তি হলে একটি অপরটি অপেক্ষা প্রাচীনতর হবে। কিন্তু তবলার ক্ষেত্রে সে কথা বলা যায় না। কাজেই যুক্তি তর্কের ভিত্তিতেও বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। [১০৬]

পুষ্কর যন্ত্র ছিলো তিনটি তাল যন্ত্রের সমাহার। তিনটিকে একত্রে ত্রিপুষ্কর বলা হতো। ত্রিপুষ্করের মধ্যে দু'টি বাদকের সামনে খাড়া করে অর্থাৎ উর্দ্ধমুখী অবস্থানে রাখা হতো। তৃতীয়টি আড়াআড়িভাবে বাদকের কোলে রাখা হতো। এগুলোর আকার ছিলো অনেকটা মৃদঙ্গের মতো। পরবর্তী সময়ে কোলে রাখা বাদ্যযন্ত্রটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে এর পরিমার্জিত রূপ হিন্দুস্তানী সংগীতের জগতে প্রধাণ তালযন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। উত্তর ভারতে এটি পাখোয়াজের রূপ লাভ করে এবং দক্ষিণ ভারতে এটি মৃদঙ্গমের রূপ লাভ করে। ত্রিপুষ্করের মধ্যে বাকী দু'টি পুষ্করের গুরুত্ব এ সময়ে কমে আসে এবং রীতিমত অবহেলিত হয়ে পড়ে। কেবল সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আঞ্চলিক এবং লোক সংগীতের সহযোগী হিসেবে খাড়া করে বাজানোর এ সকল তালযন্ত্র প্রচলিত থাকে। কালের বিবর্তনে আবার এক পর্যায়ে এসে এই বাদ্যযন্ত্রগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমান্বয়ে এগুলো অভিজাত সংগীতের উপযোগী রূপ লাভ করে এবং তবলা বাঁয়া রূপে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে স্থান করে নেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত তবলা বাঁয়া সাধারণ বা লঘু সংগীতের সহযোগী হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে ধ্রুপদের জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা কমে আসতে থাকে এবং তার পরিবর্তে খেয়ালের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। খেয়ালের সঙ্গে সহযোগী সুর যন্ত্র হিসেবে যেমন বীণ এবং রবাব বাজানো হতো, তেমনি তাল যন্ত্র হিসেবে পাখওয়াজ বাজানো হতো। খেয়ালের সঙ্গে পাখওয়াজ খুব একটা মানানসই ছিলো না। খেয়ালের সাথে এমন ধরণের তাল যন্ত্র প্রয়োজন হয়ে পড়ল যাতে করে পাখওয়াজের মত উচ্চাঙ্গের কিছু কাজ যেমন দেখানো যায়, তেমনই হালকা ধরণের কিছু কাজও যেন দেখানো যায়। এক্ষেত্রে তবলা এবং বাঁয়া ছিলো সবচেয়ে মানানসই। কাজেই যুগের দাবী অনুযায়ী আধুনিক যুগের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাথে তবলা এবং বাঁয়া সহযোগী যন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো। ক্রমে শুধু সহযোগী যন্ত্র নয়, একক বাদন অর্থাৎ তবলা লহরা বাজানোর প্রথাও খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। [১০৭]

খেয়ালের সাথে তবলা যন্ত্রের উত্তরণের সম্পর্ক আছে, সে কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্রাট মুহম্মদ শাহ্ রঙ্গিলের শাসনামল এই যন্ত্রের উৎকর্ষের সময়। এ সময় থেকেই তবলার বিভিন্ন ধরনের বাজ বিকাশ লাভ করতে থাকে।

সাধারণত ডান হাতে তবলা আর বাঁ হাতে বাঁয়া বাজানো হয়ে থাকে। সেজন্য তবলাকে অনেক সময় 'ডাহিনা' বা 'ডাইনা' বলা হয়ে থাকে। এটি কাঠের তৈরি। আকারে বাঁয়ার চেয়ে কিছুটা ছোট। তবলা আম, কাঁঠাল, নিম বা এ জাতীয় কাঠের তৈরি হয়ে থাকে। প্রথমে চোঙার আকৃতির এক টুকরা কাঠ নেওয়া হয়, এর নিচের দিক খানিকটা মোটা আর ওপরের দিক কিছুটা সরু। এই কাঠকে খুদে এর ভেতরে প্রায় অর্ধেকটা অংশ ফাঁপা করে ফেলা হয়। এর ওপরে গরু বা ছাগলের চামড়ার ছাউনি লাগানো হয়। চামড়া লাগাবার কিছু কৌশল আছে। প্রথমে তবলার মুখের ব্যাসের চেয়ে সামান্য বড় এক টুকরা চামড়া বসানো হয়। এর উপরে আরেক টুকরা বসানো হয়, এই দ্বিতীয়টি অনেকটা রিঙের মত, অর্থাৎ এর চারপাশের ব্যাস আছে কিন্তু মধ্যখান গোল করে কাটা। প্রথমটার ওপরে দ্বিতীয়টা একসাথে তবলার ফাঁপা মুখের ওপর বসিয়ে তার ওপর তবলার মুখ ঘিরে বৃত্তাকারে পাকানো বিনুনি বাঁধা হয়। বাঁধার সময় খেয়াল রাখা হয় ছাউনি যেন টান টান থাকে। এই টান টান ভাব বজায় রাখবার জন্য চামড়ার তৈরি লম্বা এক ফিতে নেওয়া হয়। একে দোয়ালী বা ছোট্ বলা হয়। তবলার ওপরের অংশে বিনুনির ভেতরে একবার এবং তবলার একেবার নিচে রিঙের মত গোল করে লাগানো আরেকটা ছোটে একবার, এভাবে বারবার অতিক্রম করানো হয়, এর ফলে এটি তবলার চারপাশ ঘুরে আসে। তবলার সুর কতখানি উঁচু বা নিচু হবে তা কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ছাউনির টানটান ভাব। ছাউনির টান কম হলে সুর নিচু হয়, বেশী হলে সুর উঁচু হয়। এই টানকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য দোয়ালির সঙ্গে আটটি কাঠের গুটি আটকানো থাকে। প্রয়োজন মত এই গুটি গুলোকে ওপরে বা নিচে নামিয়ে তবলার সুর উঁচু নিচু করা যায়। ছাউনির মাঝামাঝি জায়গায় গোল করে গাব বা খিরন লাগানো হয়। খিরন তৈরি করা হয় ময়দার সাথে লোহার গুঁড়া, কয়লার গুঁড়া এবং আঠা মিশিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

বাঁয়ার আকৃতি তবলার চেয়ে কিছুটা বড়। বাঁয়া মাটি বা ধাতু দু'ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরি হতে পারে। ধাতুর মধ্যে তামা ও পিতল ব্যবহৃত হয়। তামার দাম বেশি, তাই পিতলের ব্যবহারটাই বেশি। গঠন কৌশল অনেকটা তবলার মতই। ফাঁপা কাঠামো তৈরি করে তার ওপর ছাউনি লাগানো হয়। ছাউনির ওপর খিরন লাগানো হয়। তবে ছাউনির টান ঠিক রাখার জন্য বাঁয়াতে ধাতুর তৈরি রিঙ ব্যবহার করা হয়।

তবলার মুখের ব্যাস পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি, উচ্চতা সাধারণত সাড়ে দশ ইঞ্চি। বাঁয়ার মুখের ব্যাস আট থেকে দশ ইঞ্চি, উচ্চতায় প্রায় তবলার সমান।

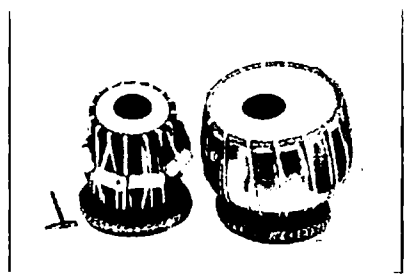

ছবি-৬৭ ঃ তবলা-বাঁয়া

প্রচলিত শুষির বাদ্যযন্ত্র ঃ বাঁশি

শুষির যন্ত্রো মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে বাঁশি। ঋক্ বেদ এবং অথর্ব বেদ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের উচ্চাঙ্গ বা লঘু সংগীত – সবক্ষেত্রে একটি অতি প্রচলিত এবং জনপ্রিয় নাম বাঁশি। প্রাচীন গুহাচিত্রে বাঁশ থেকে তৈরি বাঁশির যে রূপ দেখা যায় আধুনিক কালে তা থেকে খুব বড় কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে বাঁশি সবচেয়ে প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন যুগের মানুষ পাখির হাড়ে ফুঁ দিয়ে শব্দ উৎপন্ন করতো। এগুলো ছিলো প্রাচীন শুষির যন্ত্রের উদাহরণ। বাঁশ, নলখাগড়া ইত্যাদির ফাঁপা দেহের ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ মানুষকে বাঁশি তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করেছিলো।[১০৮] ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রাচীন কাল থেকে এদেশের সাধারণ মানুষের বাঁশি বাজানোর অভ্যাসের কথা জানা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। বিভিন্ন ধরণের লোক সংগীতে এবং পাহাড়ী অঞ্চলের গানে বাঁশি আবহমান কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু রাগ সংগীতে এর ব্যবহার তেমন প্রচলিত ছিলো না। বাঁশির রাগসংগীতে অন্তর্ভুক্তি সাম্প্রতিককালের ঘটনা। এই প্রচলনের মূল কৃতিত্ব বিশিষ্ট বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষের। [১০৯]

ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে সর্ব প্রথম বাঁশির সুস্পষ্ট এবং সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনা থেকে বাঁশির গঠন এবং বাজাবার কৌশল সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে প্রচলিত বাঁশির সাথে এই বিবরণের তেমন তারতম্য নাই। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত অজন্তার গুহাচিত্রে বংশীবাদনরত দুই রমনীর চিত্র পাওয়া গেছে। এছাড়াও সাঁচী, ইলোরা প্রভৃতির গুহাচিত্রেও বাঁশী বাজানোর অনেক চিত্র পাওয়া গেছে।[১১০] বাঁশি যে প্রাচীন কাল থেকেই কত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো তা এ সব চিত্র দেখলে বোঝা যায়। এ সব চিত্র দেখে বোঝা যায় বাঁশি কখনো বৃন্দ বাদনে ব্যবহৃত হতো, কখনো গানের সাথে বাজানো হতো, কখনো এককভাবে বাজানো হতো। তবে একথা ঠিক উচ্চাঙ্গ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাঁশির ব্যবহার প্রাচীন আমলে ছিলো না। এ কারণে 'আইন-ই-আকবরী'তে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেলেও বাঁশির কথা কোথাও পাওয়া যায় না। কারণ বাঁশী দরবারী বাদ্যযন্ত্র ছিলো না। সাধারণ মানুষের আনন্দ অনুষ্ঠান এবং পালা পার্বনে ছিলো বাঁশির ব্যবহার। অবশ্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ওস্তাদ মোহাম্মদ নামে এক শিল্পীর কথা জানা যায় যিনি খুব উঁচু দরের বংশীবাদক ছিলেন। সম্রাট তাঁকে তাঁর ওজনের সমান রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।[১১১] তবে এর পরও উচ্চাঙ্গ সংগীতে ব্যাপকভাবে বাঁশির চর্চার কথা শোনা যায় নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পান্নালাল ঘোষ (১৯১১-১১৫৯) বাঁশিকে উচ্চাঙ্গ সংগীতে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পান্নালাল ঘোষ খুব ভাল বংশীবাদক ছিলেন এবং তাঁর সময়ে বাঁশির জনপ্রিয়তা নিয়েও কোন সংশয় নেই। আড় বাঁশি অর্থাৎ আড়াআড়িভাবে যে বাঁশি বাজাতে হয়, শব্দের দিক থেকে এটি শুনতে সাধারণ বাঁশি বা সরল বাঁশির চেয়ে বেশি ভাল ছিলো এবং লোক সংগীতে এর ব্যাপক ব্যবহার ছিলো। বাঁশির দৈর্ঘ ছিলো প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার এবং ব্যাস ছিলো দেড় থেকে দুই সেন্টিমিটার। বাঁশিতে ছিদ্র ছিলো ছয়টি। উল্লেখ্য বাঁশিতে ছয়টি ছিদ্র দিয়েই হাতের কৌশলে সব কয়টি স্বর উৎপন্ন করা হয়। পান্নালাল চেষ্টা করলেন এই বাঁশিতে কিভাবে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করা যায়। কিন্তু গঠনগত কারণে বাঁশির আওয়াজে মিষ্টতার অভাব ছিলো। এছাড়া রাগদারী সংগীতের সূক্ষ্মতা প্রকাশ করা এতে সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

ছিলো না। পান্নালাল গবেষণা শুরু করলেন কিভাবে বাঁশিকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের উপযোগী করে তোলা যায়। প্রথমে তিনি বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিক, স্টিল, পিতল সব ধরণের উপাদান দিয়ে বাঁশি তৈরি করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। কিন্তু কয়েক বছর গবেষণা করার পর অবশেষে তিনি কাঙ্খিত বাঁশি আবিস্কার করতে সক্ষম হলেন। বাঁশিটি বাঁশের তৈরি। এ বাঁশিটি লম্বায় অনেক বড় এবং ব্যাসও বেশি প্রচলিত বাঁশির তুলনায়। বাঁশির দৈর্ঘ পঁচাত্তর সেন্টিমিটার এবং ব্যাস ২.৭ সেন্টিমিটার। এছাড়া পান্নালাল বাঁশিতে অতিরিক্ত একটি ছিদ্র সংযোজন করলেন। এতে করে খাদে অর্থাৎ মুদারা সপ্তকে তীব্র মধ্যম বাজানো সম্ভব হলো। বাঁশির সবগুলো ছিদ্রকে তিনি আরো বড় করলেন। ফলে আঙুলের চাপের কৌশলে বিভিন্ন রাগ পরিবেশনের সময় প্রয়োজনীয় শ্রুতি উৎপন্ন করা সম্ভবপর হলো। এছাড়া এই বাঁশির শব্দ অনেক গভীর, খাদে নিখুঁতভাবে বাজানো যায়। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে সাধারণত দুই সপ্তক বা অরো বেশি অর্থাৎ আড়াই সপ্তক পর্যন্ত বাজানো যায়। এই বাঁশির সাহায্যে পান্নালাল ঘোষ উচ্চাঙ্গ সংগীতের জলসায় আলাপ, জোড়, গৎ, বোলতান এবং ঝালাসহ সম্পূর্ণ রাগদারী বাদন পরিবেশন করতে শুরু করলেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে একক বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এভাবে বাঁশি প্রতিষ্ঠা লাভ করল। [১১২]

বাঁশের সরু নল কেটে বাঁশি তৈরি করা হয়। সাধারণ বাঁশি এক দেড় ফুট লম্বা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের জন্য বাঁশের দৈর্ঘ বেশি নিতে হয়, বাঁশের ব্যাসও বেশি থাকা দরকার। মাথার দিকে একটি গিঁট রেখে বাঁশ কাটা হয়, যাতে ওপরের দিকটা বন্ধ থাকে। বাঁশির অপর প্রান্ত খোলা থাকে। গিঁটের কাছে একটি গোল ছিদ্র করা হয়। এটিকে বলা হয় ফুৎকার রন্ধ্র। এর নিচে পর পর ছয়টি গোল ছিদ্র করা হয়। এগুলোকে বলা হয় তাররন্ধ্র। ফুৎকার রন্ধ্রে মুখ রেখে আড়াআড়িভাবে বাঁশিটি ধরে অপর ছিদ্রগুলোতে দুই হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে বাঁশি বাজানো হয়।

আকার ও প্রকার ভেদে বাঁশির বিভিন্ন নাম আছে। যেমন, আড়বাঁশি, কদবাঁশি, টিপারা বাঁশি ইত্যাদি। এর মধ্যে আড়বাঁশি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এর অপর নাম মুরলি অথবা মোহনবাঁশি। আড়াআড়িভাবে ধরে এ বাঁশি বাজাতে হয়। দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের মধ্যভাগে টিপ দিয়ে ধরে বাম হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটি আঙুল বাঁশির ওপর দিককার তিনটি ছিদ্রের মুখে এবং ডান হাতের ঐ তিনটি আঙুল নিচের তিনটি ছিদ্রের উপর রেখে প্রয়োজন মত আঙুলের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে আড়বাঁশি বাজাতে হয়।

কদবাঁশির মাথা তেরছাভাবে কেটে কাঠের পাতলা খিল আঁটা হয়। খিল পুরোপুরি বন্ধ না রেখে ঈষৎ ছিদ্রপথ রাখা হয়। সেই ছিদ্রপথে ফুঁ দিলে এই বাঁশি বাজে। এর নিচে চারকোনা একটি উন্মুক্ত বায়ুরন্ধ্র থাকে। কদবাঁশির ওপরের অংশ দেখতে অনেকটা হুইসেলের মত। অঞ্চলভেদে কদবাঁশির বিভিন্ন নাম আছে। যেমন, মুখের কাছে খিল থাকে বলে ফরিদপুরে একে 'খিলবাঁশি' বলা হয়, মুখের মধ্যে পুরে বাজাতে হয় বলে উত্তরবঙ্গে একে 'মুখবাঁশি' বলা হয়, 'সরল বাঁশি' নামেও এটি পরিচিত, আবার কলমের মত দেখতে বলে অনেকে একে 'কলম বাঁশি' বলে।[১১৩] তবে কলম বাঁশির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেছেন যে, এটি নাতিদীর্ঘ, সাতটি ছিদ্র থাকে এবং মাথার দিকে, যেখানে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়, সেখানে দেশী সানাইয়ের মত একটি তালপাতার রিড থাকে। [১১৪]

টিপারা বাঁশির উভয় মুখ খোলা এবং এতে আটটি ছিদ্র থাকে। কদবাঁশির মত মাথায় ফুঁ দিয়ে এটি বাজাতে হয়। তবে উভয় প্রান্ত খোলা থাকে বলে এর বাদনে বিশেষ কৌশল ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।[১১৫]

ছবি-৬৮ ঃ বাঁশি

.. ..

১. দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৯১, পৃ ঃ ৮৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮৪।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮৪।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯০।

৬. http://en.wikipedia.org/wiki/Harp

৭. দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৯১, পৃ ঃ ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

৮. http://en.wikipedia.org/wiki/Lyre

৯. দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৯১, পৃ ঃ ৯২।

১০. http://en.wikipedia.org/wiki/Lute

১১. দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৯১, পৃ ঃ ১০৭।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮৮।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮৮।

১৪. http://en.wikipedia.org/wiki/Zither

১৫. দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৯১, পৃ ঃ ১০৪।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১০৫।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯৫।

১৮. www.istov.de/htmls/myanmar/myanmar_start.html

১৯. Coomarswami, Anand K.: "The parts of a vina", journal of the American Oriental Society, 1931, পৃ ঃ ২৪৪-২৫৩।

২০. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী ঃ "ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস" (প্রথম ভাগ), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭ ইং, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কোলকাতা, পৃ ঃ ২৯৪।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২১৭।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩০১।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮০।

২৪. দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৯১, পৃ ঃ ৯৯।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১০১।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫।

২৮. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ২০।

২৯. Kasliwal, Dr Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co New Delhi, পৃঃ ১১৫।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১২১।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৫৬।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৫৮।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১১১।

৩৫. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ১৮।

৩৬. http://yellowbellmusic.com/instruments/string/history_sitar.php

৩৭. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ২৪।

৩৮. www.buckinghammusic.com/sitar/aboutsitar.htm

৩৯. দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৯১, পৃ ঃ ১০৬।

৪০. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ২৬।

৪১. Tarlekar, G.H. & Naloni: "Musical Instruments in Indian Sculpture", Pune Vidyarthi Griha Prakashan, 1972, পৃঃ ৮৮-৮৯।

৪২. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ২৬।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৭।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৬।

৪৫. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ১৪১।

৪৬. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ২৮-২৯।

৪৭. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৩০।

৪৮. দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৯১, পৃ ঃ ৭৫।

৪৯. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition,

Dhaka University Institutional Repository

Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৩১।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩২।

৫১. http://yellowbellmusic.com/instruments/string/history_sitar.php

৫২. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৩৩।

৫৩. Mirza, Dr.Wahid : "The Life and Works of Amir Khasru", Idarah-I Adabiyat-I Delli, reprint 1974, পৃ ঃ ২৪০।

৫৪. মুস্তাফা, ম.ন. ঃ "আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে", ১৯৮১ ইং, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ ঃ ২০১।

৫৫. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/612394/ud

৫৬. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৩২।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৩-২৪।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩২।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪২।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪২।

৬১. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ১৪৪-১৪৬।

৬২. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃঃ ৬০।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬০।

৬৪. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৬৪।

৬৫. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৬২।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২০।

৬৭. মিত্র, রাজ্যেশ্বর ঃ "মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা", পরিবর্ধিত প্রকাশ, ১৯৮৫, নবপত্র প্রকাশন,

Dhaka University Institutional Repository

কলিকাতা, পৃঃ ২২।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫৫।

৬৯. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৬৫।

৭০. McNeil, Adrian : "Inventing the Sarod : a Cultural History", Seagull Books Private Limited, Calcutta, New Delhi, 2004. পৃ ঃ ২৬।

৭১. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৬০।

৭২. McNeil, Adrian : "Inventing the Sarod : a Cultural History", Seagull Books Private Limited, Calcutta, New Delhi, 2004. পৃ ঃ ৭।

৭৩. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৬৬।

৭৪. McNeil, Adrian : "Inventing the Sarod : a Cultural History", Seagull Books Private Limited, Calcutta, New Delhi, 2004. পৃ ঃ ৭।

৭৫. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃঃ ৬১।

৭৬. McNeil, Adrian : "Inventing the Sarod : a Cultural History", Seagull Books Private Limited, Calcutta, New Delhi, 2004. পৃ ঃ ৭।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৯।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৭।

৭৯. Gosvami, O : "Story of Indian Music: Its Growth and Synthesis", Asia Publishing House, Mumbai, 1957, Page: 302-303।

৮০. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ১৬৪।

৮১. Perera, E.S. : "The Origin and Development of Dhrupad and its Bearings on Instrumental Music", K P. Bagchi and Co, Calcutta, 1994 , পৃ ঃ ১৯৩।

৮২. McNeil, Adrian : "Inventing the Sarod : a Cultural History", Seagull Books Private

Dhaka University Institutional Repository

Limited. Calcutta, New Delhi, 2004. পৃ ঃ ৯৪ ।

৮৩. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ১৭১ ।

৮৪. McNeil, Adrian : "Inventing the Sarod : a Cultural History", Seagull Books Private Limited. Calcutta, New Delhi, 2004. পৃ ঃ ১৬৯ ।

৮৫. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ১৭২ ।

৮৬. দেব, বি.চৈতন্য ঃ "ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র", ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৯৯১, পৃ ঃ ১১৬ ।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১১৮ ।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১২০ ।

৮৯. Bor, Joep: "The Voice of Sarengi", Quarterly Journal Vol.XV, 3 & 4, Vol XVI, 1 N.C.P.A. Sept-Dec 86 & Mar 87) পৃ ঃ ৫১ ।

৯০. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ১৭৮ ।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৭৯ ।

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৮০ ।

৯৩. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৫৭ ।

৯৪. খান, মুহম্মদ করম ইমাম ঃ "মাদান-আল-মুসিকী", হিন্দুস্তানী প্রেস, লখনৌ, প্রথম সংস্করণ ১৮৫৬, পৃঃ ৫৯ ।

৯৫. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৫৮ ।

৯৬. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ১৯১ ।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৯১ ।

৯৮. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ১৯১ ।

Dhaka University Institutional Repository

৯৯. Tagore, Sourindro Mohun :"A Treasury of the Musical Instruments of Ancient and Modern India, and of Various other Countries", Reprint,1976, New York:AMS Press, পৃঃ ৫৭।

১০০. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ১৯২।

১০১. http://en.wikipedia.org/wiki/esraj

১০২. Miner, Allyn : "Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries", First Indian Edition, Delhi 1997, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, India, পৃ ঃ ৫৯।

১০৩. দাশশর্মা, অমল ঃ সংগীত মনীষা, দ্বিতীয় খণ্ড, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৭৯, পৃ ঃ ২৩৯।

১০৪. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী ঃ ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, পৃ ঃ ৩০৬।

১০৫. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ৩৬।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৯।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৮।

১০৮. রায়, সুকুমার ঃ "ভারতীয় সংগীত ইতিহাস ও পদ্ধতি", ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃঃ ১৬৯।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৮১।

১১০. Kasliwal, Dr. Suneera : "Classical Musical Instruments", 2001, Rupa & Co. New Delhi, পৃঃ ৭১।

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৭৩।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৭৪।

১১৩. চক্রবর্তী, উত্তম ঃ "বাঁশির প্রথম পাঠ", জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮ পৃ ঃ ২২,২৩।

১১৪. মিত্র, শ্রীসনৎকুমার ঃ "পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য", পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃ ঃ ৫৯।

১১৫. চক্রবর্তী, উত্তম ঃ "বাঁশির প্রথম পাঠ", জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮ পৃ ঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বাদ্যযন্ত্র নির্মানে বাংলাদেশের সংগীতজ্ঞদের ভূমিকা ও অবদান

বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে বাংলাদেশের কয়েকজন কালজয়ী শিল্পীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন ওস্তাদ আয়েত আলী খান। সরোদ উদ্ভাবনে তাঁর অবদানের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই গুণী শিল্পী এবং বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা সম্পর্কে বিশিষ্ট সংগীত গবেষক, লেখক, অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে অবস্থিত ম্যাকোয়ারি ইউনিভার্সিটির 'কনটেমপোরারি মিউজিক স্টাডিজ' বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এবং বিশিষ্ট সরোদ বাদক ড.এড্রিয়ান ম্যাকনিল তাঁর 'Inventin the Sarod : a Cultural History' গ্রন্থে লিখেছেন – "Ayet Ali Khan, the yonger brother of Alauddin Khan, was a Surbahar player and gifted luthier (বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা). The brothers started an instrument making business in the Brahminbaria district of what was the then East Bengal. Ayet Ali made a series of sarods that culminated in the instruments he made for his nephew Ali Akbar Khan and his son Bahadur Khan." [১]

সরোদের আধুনিক রূপদানের পেছনে রয়েছে ওস্তাদ আয়েত আলী খান (১৮৬২-১৯৭২) এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান (১৮৮৪-১৯৬৭), এই দুই ভাইয়ের সুদীর্ঘ গবেষনার ইতিহাস। ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে একটি সংগীতপ্রেমী পরিবারে এই দুই ভাইয়ের জন্ম। পিতা সফদর হোসেন খান ছিলেন একজন সৌখিন সেতারবাদক। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে সবাই সংগীত শিল্পী ছিলেন। এর মধ্যে তিনজন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান। সফদর আলী খানের দ্বিতীয় পুত্র ফকির (তাপস) আফতাবউদ্দিন খান অসাধারন তবলাবাদক এবং বংশীবাদক ছিলেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান এবং ওস্তাদ আয়েত আলী খানের প্রথম গুরু ছিলেন তিনিই। আফতাবউদ্দিন খান ন্যাস তরঙ্গ নামে একটি যন্ত্র বাদনেও খুব দক্ষ ছিলেন। এই যন্ত্র বাজানো অত্যন্ত কঠিন এবং বাজানোর পদ্ধতিও অভিনব। এটি শুষির গোত্রের যন্ত্র হলেও ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় না। যন্ত্রে দু'টি বাঁশির মত অংশ থাকে, কিন্তু তাতে কোন ছিদ্র থাকে না। এগুলোর মধ্যে একটি করে ঝিল্লিময় সূক্ষ্ম অংশ থাকে। বাদক যন্ত্র দু'টি গলার দু'পাশে লাগিয়ে গলার তন্ত্রীতে শ্বাস-প্রশ্বসের আশ্চর্য কৌশলে চাপ দেওয়ার ফলে ঐ ঝিল্লিময় অংশে বায়ুতরঙ্গ আন্দোলিত হয়। এ থেকে সুর সৃষ্টি হয়। এতে সুরের সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখানো যায়, কিন্তু বাজানোর কৌশল কষ্টসাধ্য। বর্তমানকালে এই যন্ত্রের বাদক খুঁজে পাওয়া যায় না। [২] এ ধরণের কঠিন বাদ্যযন্ত্র বাজানোর আশ্চর্য

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা ছিলো আফতাবউদ্দিনের। শুধু বাদনে তিনি পটু ছিলেন তা নয়। আফতাবউদ্দিন খান নিজে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রও উদ্ভাবন করেছিলেন। নিচে এগুলো সম্পর্কে অলোচনা করা হলো।

চিত্র-৬৯ ঃ ফকির (তাপস) আফতাবউদ্দিন খান

'স্বর-সংগ্রহ' এবং 'মেঘডম্বুর' –

স্বর-সংগ্রহ এস্রাজ জাতীয় একটি তত গোত্রের বাদ্যযন্ত্র। স্বর-সংগ্রহের দণ্ডটি এস্রাজের মত কিন্তু খোলটি সরোদের মত। খেলটি ফাঁপা এবং এতে চামড়ার ছাউনি দেওয়া থাকে। খোলের সংগে একটি ফাঁপা দণ্ড সংযুক্ত থাকে। দণ্ডের বুকে পটরী আবদ্ধ থাকে। স্বর-সংগ্রহের মাথাটি পাখির মত। মাথায় চারটি কাঠের গোল খুঁটি বা বয়লা লাগানো থাকে। পটরীর উপরের দিকে দু'টি তারগহন দণ্ডের সাথে সংযুক্ত। দণ্ডের পাশে ষোল থেকে কুড়িটি চেপ্টা কাঠের বয়লা লাগানো থাকে। পটরীর বুকে পিতল বা জার্মান সিলভারের তৈরি বারোটা পর্দা মুগা সুতা দিয়ে দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা থাকে। খোলের বুকে আবৃত চামড়ার ছাউনির মাঝখানে একটি হাড়ের সওয়ারি স্থাপিত। খোলের প্রান্তভাগে একটি পিতলের লেঙুট সংযুক্ত। স্বর-সংগ্রহের প্রধাণ তার চারটি এবং তরফের তার ষোল থেকে কুড়িটি। প্রধাণ তারগুলো দণ্ডের মাথায় আবদ্ধ চারটি বয়লা থেকৈ তারগহন ও সওয়ারির উপর দিয়ে লেঙুটের সাথে আবদ্ধ থঅকে। নায়কী তার বা প্রধাণ তারটি লোহার, বাকী তিনটা পিতলের। তরফের তারগুলো দণ্ডের পাশে আবদ্ধ চেপ্টা বয়লা থেকে পটরীর বুকে সংযোজিত কীলকের ভিতর দিয়ে সওয়ারির ছিদ্র দিয়ে লেঙুটে সংযুক্ত। তরফের তারগুলোর জন্য সওয়ারিতে প্রধাণ তারগুলোর নিচে ছিদ্র থাকে। তরফের তাগুলো পিতলের।

ফকির আফতাবউদ্দিন খান উদ্ভাবিত আরেকটি যন্ত্র 'মেঘডম্বুর'। এটি সহজ সরল তারের যন্ত্র। প্রস্তুত প্রণালীও অতি সাধারণ। প্রায় এক হাত লম্বা ও প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া একটি বাঁশের চটার সঙ্গে একটি রোহার তার সংযুক্ত করে মেঘডম্বুর যন্ত্রটি তৈরি হয়। বাঁশের চটাটি সুন্দরভাবে মসৃণ করে নেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চটার মাথা দু'টিতে তার সংযোজনের জন্য কিছুটা কেটে নিতে হয়। যন্ত্রটি দেখতে ধনুকের মত। একটি ছোট ছড় দিয়ে এটি বাজাতে হয়। এর সুর বেশ মিষ্টি। [৩]

'চন্দ্র সারঙ্গ', 'কাঠ-তরঙ্গ', 'বাঁশ-তরঙ্গ' এবং 'নল-তরঙ্গ' –

চিত্র-৭০ ঃ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান

এই যন্ত্রগুলোর আবিস্কর্তা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান। সরোদ যন্ত্রের আধুনিক রূপদানে তাঁর অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর সকল পরিকল্পনার রূপকার ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওস্তাদ আয়েত আলী খান। সরোদ ছঅড়াও আরো কয়েকটি নতুন বাদ্যযন্ত্র আবিস্ক রে তাঁর অবদান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের প্রপৌত্রী সাহানা খান তাঁর "Boro Baba...Ustad Alauddin Khan" গ্রন্থে লিখেছেন,

"Boro Baba gave the Sarode a new form because he realized that in its traditional form it was not suitable for the Dhrupad style. Incollaboration with his brother, Ustad Ayet Ali Khan, he made several modifications...He devised and introduced several new instruments, creating the Chandrasarang.....Then he made the Nal Tarang from gun barrels which is played with a piece of iron." [৪]

চন্দ্র সারঙ্গ বাংলাদেশের পল্লী সংগীতে আরেকটি নতুন সংযোজন। সারিন্দা যন্ত্রের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতিতে এই যন্ত্রের উদ্ভব। এক সারিন্দা যন্ত্রের উন্নত সয়স্করণ বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মনবাড়িয়ার নিভৃতচারী সংগীত সাধক সফদর হোসেন খানের তৃতীয় পুত্র বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পরামর্শে উপমহাদেশের অন্যতম শেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আয়েত আলী খান এই যন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

তৈরি করেন। চন্দ্র সারঙ্গ যন্ত্রটি সারিন্দার চেয়ে বড়। আকৃতি সারিন্দার মত। একটা নিরেট কাঠের খণ্ডতে খোদাই করে খোল তৈরি করা হয়। খোলের ভিতরটা ফাঁপা। খোলে বুকে টামড়ার ছাউনি লাগানো থাকে। খোলের সঙ্গে দণ্ড সংযুক্ত । দণ্ডের ভিতরটা ফাঁপা। দণ্ডটির বুকে ইস্পাতের পাত বসানো থাকে। একে বলে পটরী। পটরীর উপরের অংশটি জীবজন্তু বা পাখির মাথার আকৃতিতে প্রস্তুত করা হয়। এই অংশে তার সংযোজনের জন্য বয়লা লাগানো হয়। মূল তার তিনটি। তাছাড়া আরো নয়টি তার অনুরণনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই নয়টি তার দণ্ডের একপাশে আবদ্ধ নয়টি চেপ্টা বয়লার সঙ্গে সংযোজিত থাকে। এই নয়টি তার পিতলের। খেঅলের উপর স্থাপিত হয় কাঠ বা হাড়ের তৈরি একটি সওয়ারি। খোলের শেষ প্রান্তে একটি লেঙুট খোলের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয়। সব ক'টি তার লেঙুট থেকে টেনে নিয়ে বয়লাতে আটকানো হয়। সুর বাঁধার নিয়ম সারিন্দার মত। সারিন্দার মতই এই যন্ত্র ছড় দিয়ে বাজাতে হয়। চন্দ্র সারঙ্গ এককভাবে বাজানো হয়ে থাকে। প্রয়োজনবোধে পল্লীগানের সঙ্গেও বাজানো যেতে পারে।[৫]

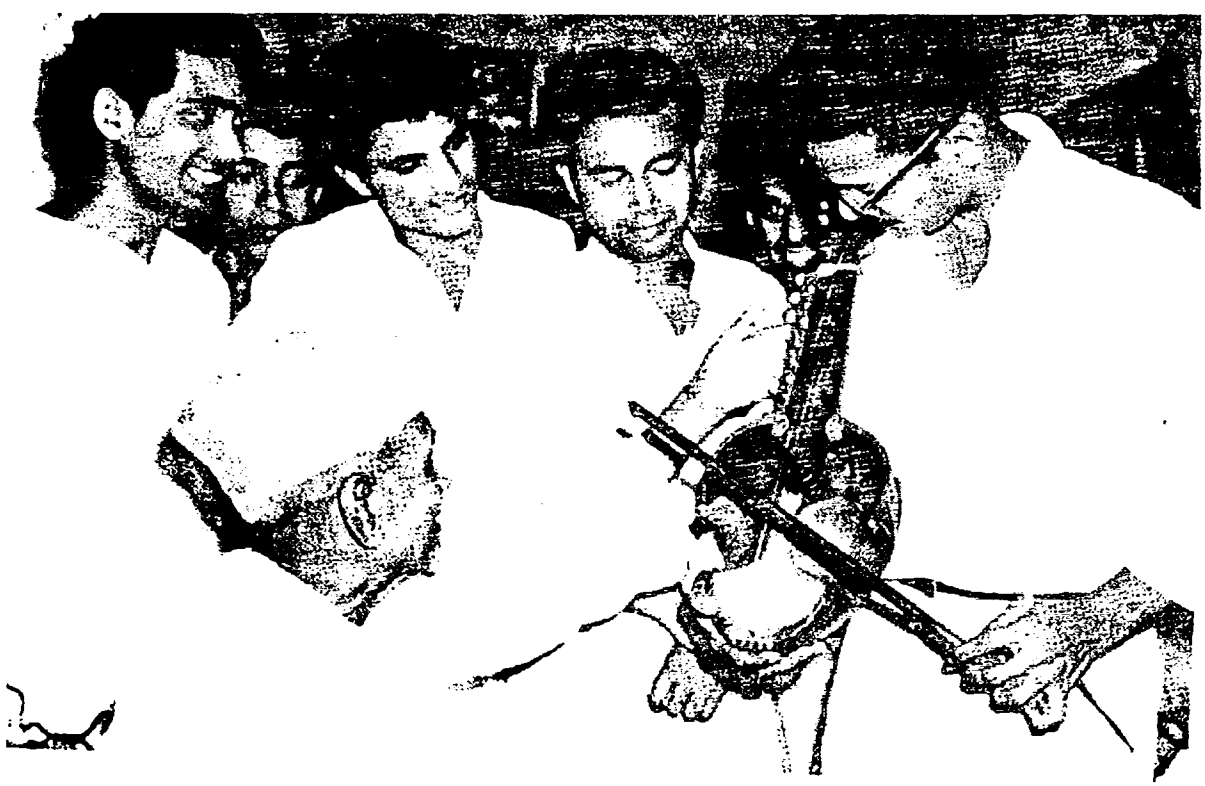

চিত্র-৭১ ঃ ছাত্রদেরকে চন্দ্রসারঙ্গ দেখাচ্ছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান

Dhaka University Institutional Repository

'কাঠ-তরঙ্গ' নামে আরেকটি বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান। শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরি হয় কাঠ-তরঙ্গ। নিরেট কাঠ কেটে একটি বাক্সে সাজিয়ে রেখে এই যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়।

জল তরঙ্গ যন্ত্রে যেমন এক একটি বাটিতে পরিমাণমত পানি ভরে নির্দিষ্ট স্বর উৎপন্ন করা হয়, অনেকটা সেই সূত্র অনুযায়ী এই যন্ত্রে বিভিন্ন মাপের কাঠের খণ্ড কেটে বাক্সে স্থাপন করা হয় যাতে এক একটি কাঠের খণ্ড থেকে এক একটি স্বর উৎপন্ন হয়। কাঠির সাহায্যে এই সব কাঠের খণ্ডের উপরে আঘাত করে কাঠ-তরঙ্গ বাজাতে হয়।

একই ধরণের আরেকটি যন্ত্রের নাম বাঁশ-তরঙ্গ। এর উদ্ভাবকও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান। শুকনো মুলি বাঁশ থেকে এই যন্ত্র তৈরি হয়। মুলি বাঁশ চোঙার আকারে কেটে নিতে হয়। চোঙাগুলো এমনভাবে কাটা হয় যেন বাজাবার সময় আঘাত করলে ফেটে না যায়। কাঠ তরঙ্গে যেভাবে নির্দিষ্ট স্বরের প্রয়োন অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাপে কাঠের খণ্ড কেটে নিতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে এই যন্ত্রেও এমন মাপে এক একটি বাঁশের চোঙা কেটে নিতে হয় যাতে করে প্রতিটি থেকে নির্দিষ্ট একটি স্বর উৎপন্ন হয়।[৬]

'নল-তরঙ্গ' একই গোত্রভুক্ত আরেকটি যন্ত্র। মাইহারের রাজদরবারে অবস্থানকালে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান এই যন্ত্র প্রস্তুত করেন। রাজার সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত বন্দুকের নল নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী কেটে তার সাহায্যে তিনি এই যন্ত্র তৈরি করেন। এই যন্ত্রেও বিভিন্ন মাপের লোহার নল কেটে নিয়ে বাক্সে স্থাপন করা হয়। এক একটি নল থেকে এক একটি স্বর উৎপন্ন হয়। এক খণ্ড লোহার সাহায্যে আঘাত করে এই যন্ত্র বাজাতে হয়।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

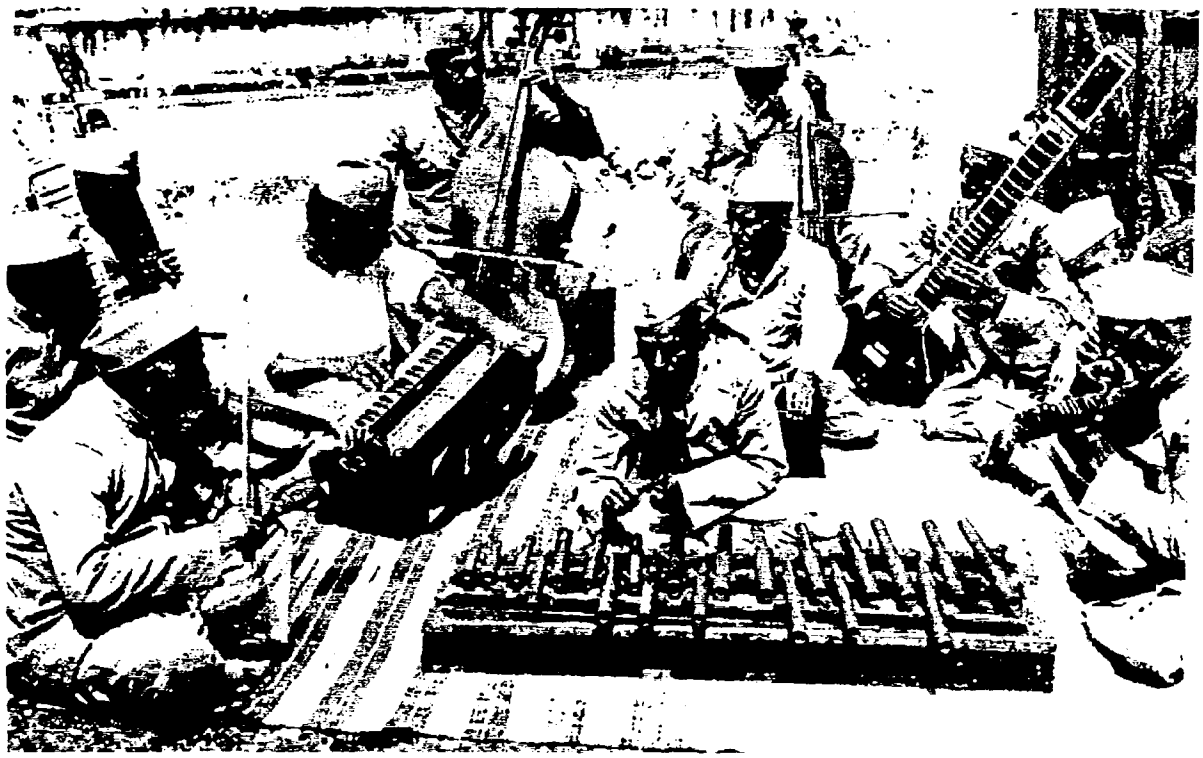

চিত্র-৭২ ঃ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের ব্যান্ডে ব্যবহৃত নলতরঙ্গ

'মনোহরা' এবং 'মন্দ্রনাদ' –

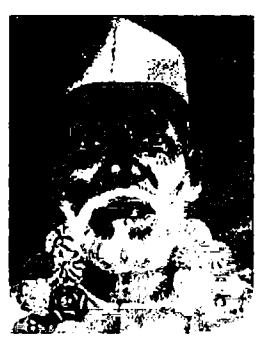

চিত্র-৭৩ ঃ ওস্তাদ আয়েত আলী খান

সফদর হোসেন খানের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ, সুরবাহার বাদক এবং বিশিষ্ট বাদ্যয়ন্ত্রনির্মাতা ওস্তাদ আয়েত আলী খান। তিনি এস্রাজ যন্ত্রটির সংস্কার সাধন করে একটি নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন এবং এই যন্ত্রের নাম দেন মনোহরা। সুরের মাধুর্যের দ্বার মন হরন করে নেয় বলে এই যন্ত্রের নামকরণ করা হয় 'মনোহরা'।

Dhaka University Institutional Repository

মনোহরা যন্ত্রটির আকৃতি ও গঠন অনেকটা এস্রাজের মত। তবে সুরে বৈচিত্র আনয়ন এবং মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য এর খোলটির গঠন প্রণালীতে কিছু পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। খোলটি অনেকাটা আমের আকৃতিতে তৈরি করা হয়। খোলের বুকে চামড়ার ছাউনি দেওয়া থাকে। খোলটি খোদাইয়ের কৌশলে উপরে যন্ত্রটির সুরের উৎকর্ষ নির্ভর করে। খেঅলের সঙ্গে একটা ফাঁপা দণ্ড সংযুক্ত করা হয়। এর নাম পটরী। পটরীর বুকে এস্রাজের মত ষোলটি পিতলের পর্দা শক্ত মুগা সুতা দিয়ে আটকানো হয়। পটরীর মাথায় চারটি কাঠের বয়লা দণ্ডের সঙ্গে লাগানো হয়। বয়লার নিচে হাড়ের তৈরি দু'টি তারগহন। দণ্ডের একপাশে একটা কাঠের ফলক লাগিয়ে তাতে বারোটি তরফের তার সংযোজনের জন্য বারোটি চেপ্টা বয়লা লাগানো হয়। খেঅলে আবদ্ধ চামড়ার ছাউনির উপরে একটি হাড়ের সওয়ারি থাকে। নিচে কিছুটা পিছনের দিকে একটি লেঙুট থাকে। প্রধান চারটি তার প্রধাণ চারটি বয়লা থেকে তারগহন এবং সওয়ারির উপরে আবদ্ধ থাকে। ঠিক তেমনি তরফের বারোটি তার চেপ্টা বয়লাগুলো থেকে সওয়ারির গায়ে বারোটি ছিদ্র দিয়ে গিয়ে লেঙুটে আবদ্ধ থাকে। এস্রাজের ছড়ের মত ছড় দিয়ে মনোহরা যন্ত্রটি বাজাতে হয়।[৮]

মন্দ্রনাদ একটি খাদ বা মন্দ্র স্বরের একটি বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রটি পাশ্চাত্য চেলো যন্ত্রের অনুকরণে তৈরি হয়েছে। ওস্তাদ আয়েত আয়েত আলী খান এর উদ্ভাবক। পাশ্চাত্য যন্ত্রকে দেশজ ঢঙে তৈরে করে দেশীয় সুরের ঝঙ্কার সৃষ্টির মাধ্যমে সংগীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলাই মন্দ্রনাদ যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

মন্দ্রনাদের দেহ চেলোর দৈহিক গঠনের মত। বলা যায় বেহালার বৃহৎ সংস্করণ। কাঠ দিয়ে বেহালার মত করে প্রথমে এই অবয়ব তৈরি করতে হয়। ফাঁপা মূল অংশটিকে 'বেলি' বলা হয়। 'বেলি' বা পেটের সাথে দণ্ডাকৃতির অংশ যুক্ত হয়, যাকে 'নেক' বা ঘাড় বলা হয়। নেকের বুকে পটরী বা ফিংগারবোর্ড সংযোজন করা হয়। এটি সাধারণত কালো রঙের হয়ে থাকে। পটরীর উপরের অংশের কাঠ একটু উঁচু করে দেওয়া হয় যা তারগহনের কাজ করে। নেকের উপরিভাগ একটু বাঁকানো। তার সংযোজনের জন্য নেকের শেষ প্রান্ত বা পেগ বক্সে চারটি কাঠের খুঁটি বা বয়লা লাগানো হয়। 'বেলি'র বুকে কাঠের তৈরি একটি সওয়রি থাকে। সওয়ারির দু'পাশে শব্দ বের হওয়া জন্য দু'টো ফাঁক থাকে। একে বলে 'সাউন্ড হোল'। সাউন্ড হোলের পাশে বেলি ও নেকের মধ্যবর্তী অংশে একটি কাঠি সংযোজন করা হয়। একে বলে 'সাউন্ড স্টিক'। শেষ প্রান্তে তার সংযোজনের জন্য লেংগুট লাগানো হয়। মন্দ্রনাদের চারটি তারের মধ্যে দু'টি

Dhaka University Institutional Repository

তাঁতের, একটি পিতলের এবং একটি লোহার। পটরীর বুকে বাঁ হাতের আঙুল চেপে এবং ডান হাতে ছড়ের সাহায্যে মন্দ্রনাদ বাজাতে হয়। এর ছড় এস্রাজের চেয়ে কিছুটা বড় হয়।[৯]

এই সকল বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতের সময় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান সব সময় ওস্তাদ আয়েত আলী খানের সাথে পত্র দ্বারা যোগাযোগ রাখতেন এবংয় সার্বক্ষনিক বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতেন। এমনকি উদয় শঙ্করের নৃত্যদলের সঙ্গে বিশ্ব ভ্রমনের সময়ও তিনি চিঠিতে এই সকল যন্ত্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে সচিত্র বিবরণ দিয়েছেন।

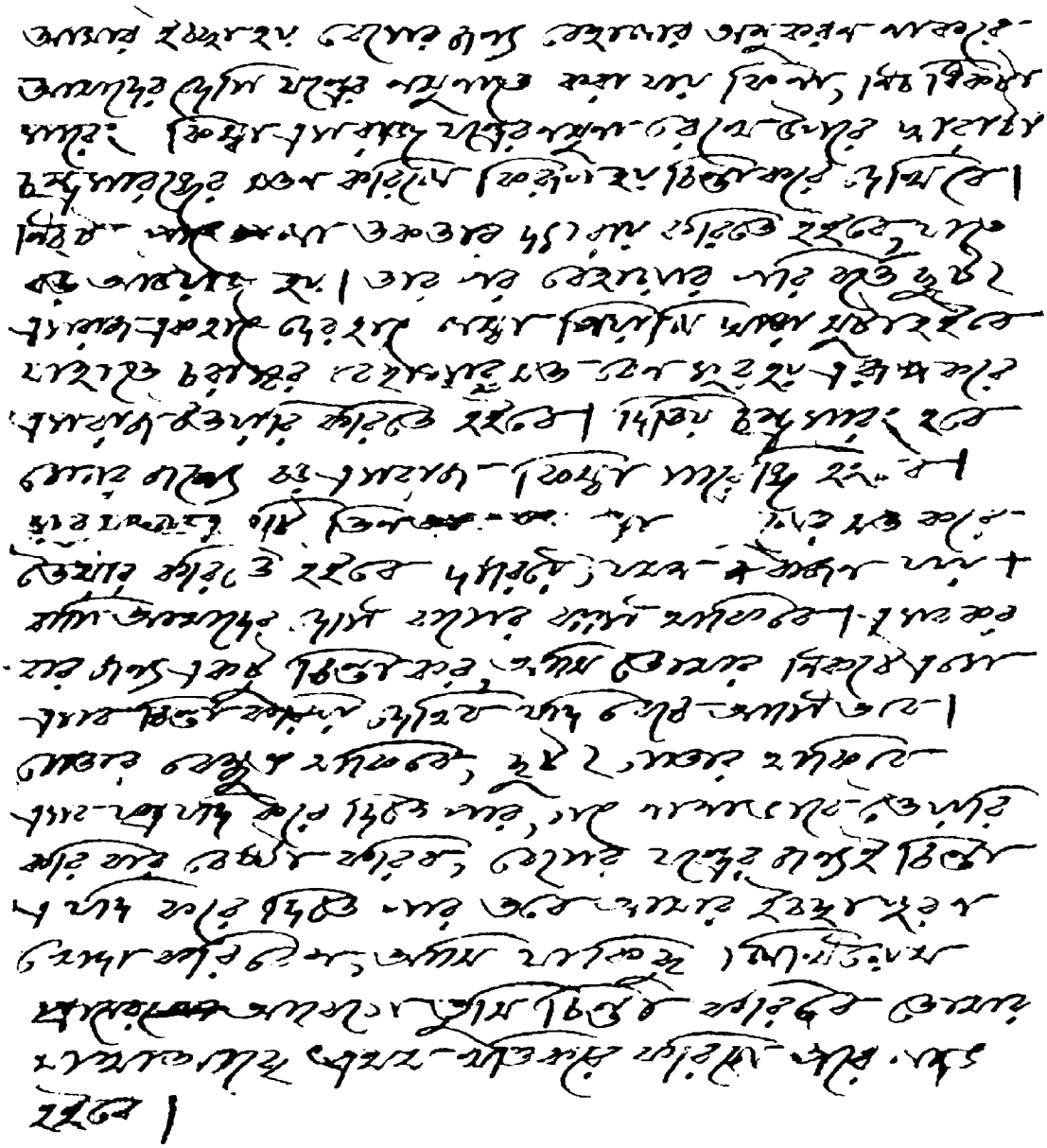

চিত্র-৭৪ ঃ ওস্তাদ আয়েত আলী খানকে লেখা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের চিঠি।

Dhaka University Institutional Repository

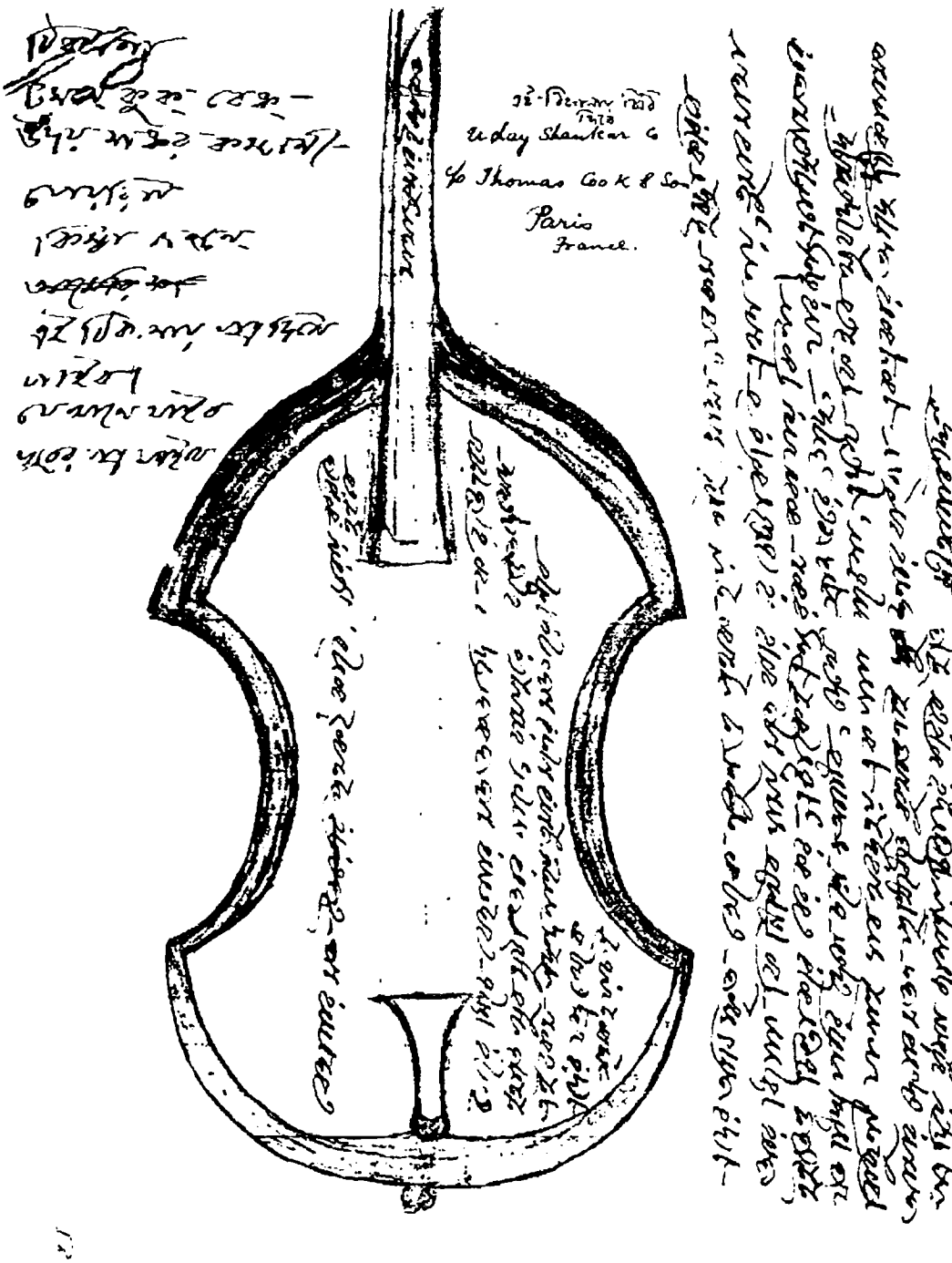

চিত্র-৭৫ ঃ চিঠিতে অঙ্কিত বাদ্যযন্ত্রের নকশা

Dhaka University Institutional Repository

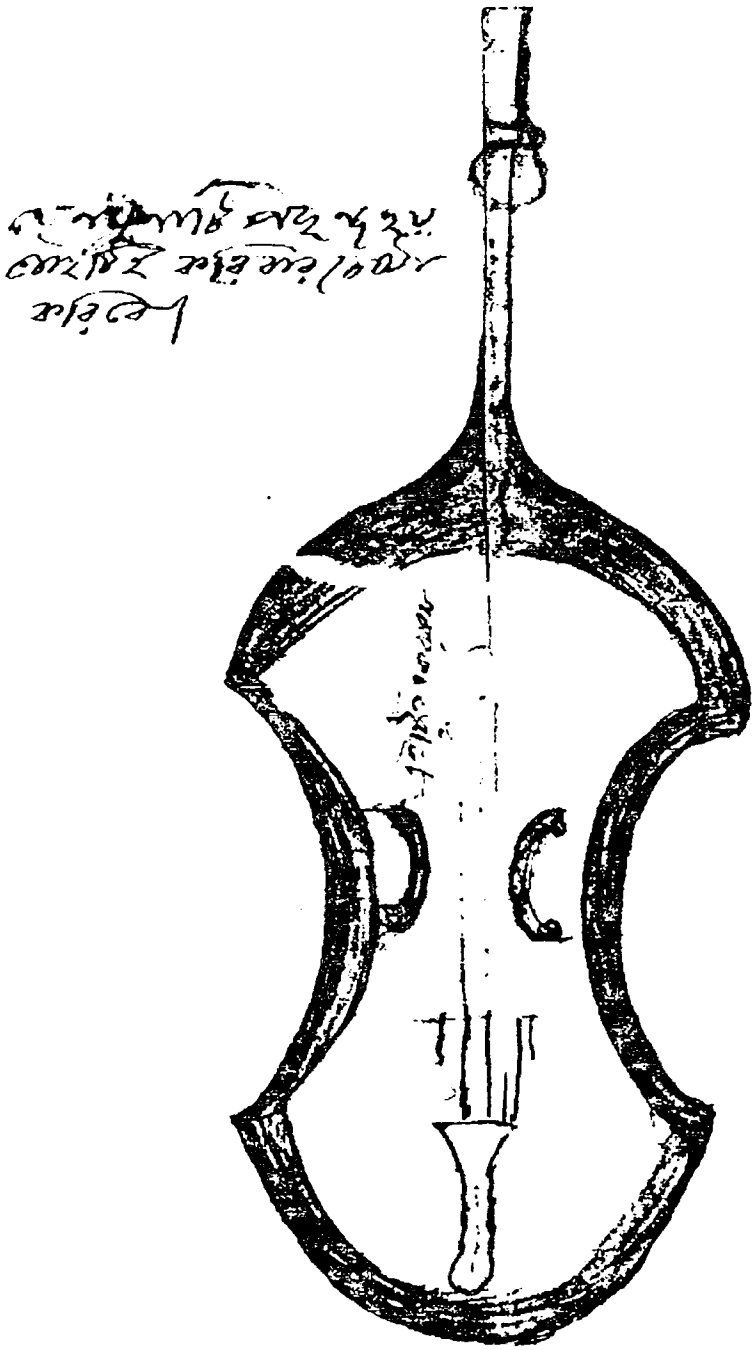

চিত্র-৭৬ ঃ চিঠিতে অঙ্কিত আরেকটি নমুনার নকশা

Dhaka University Institutional Repository

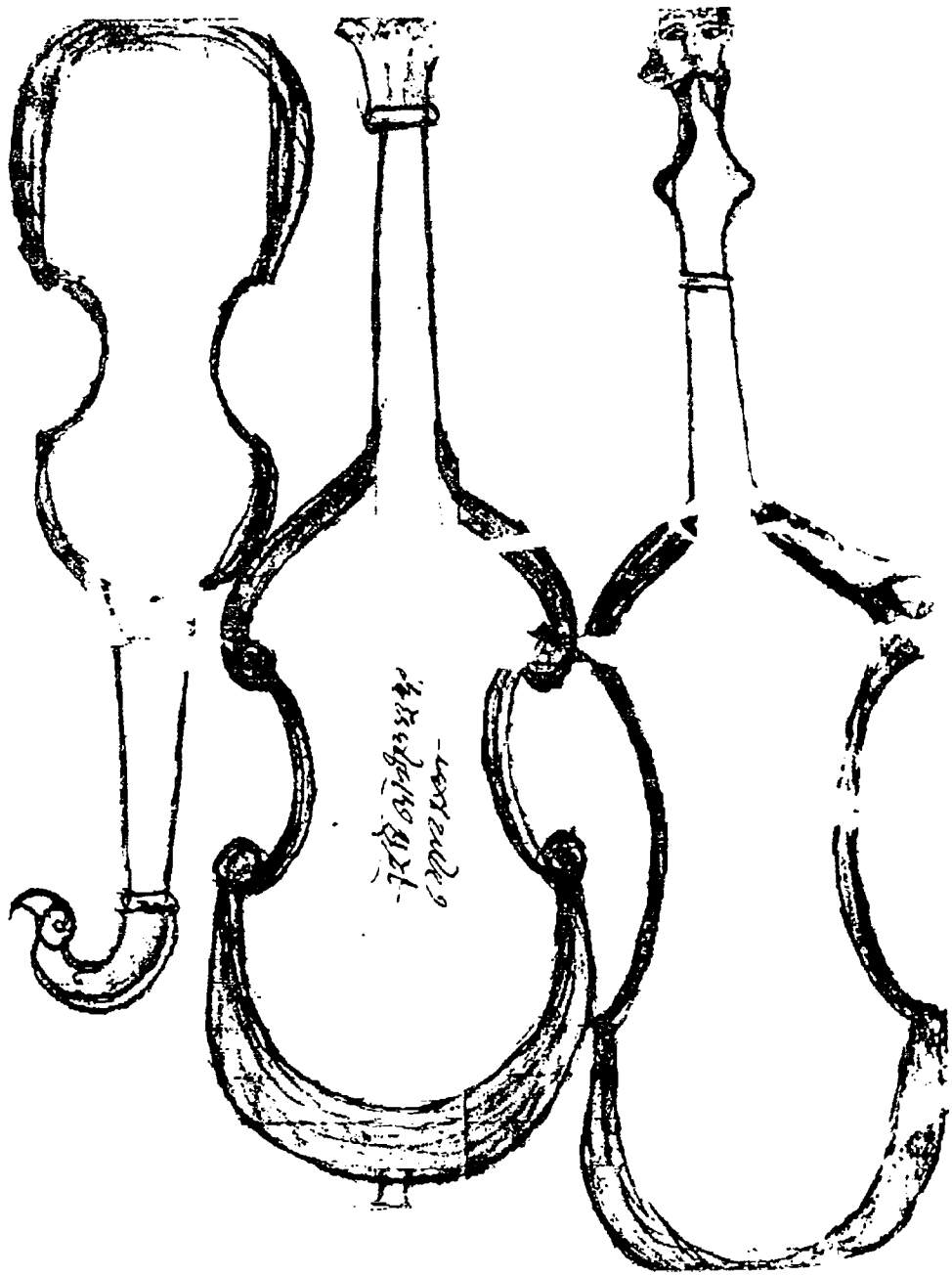

চিত্র-৭৭ ঃ বিভিন্ন দিক থেকে বাদ্যযন্ত্র দেখতে যেমন হবে তার নকশা

"আমার ইচ্ছা হয় বেসের জন্য বেহালার অনুকরণ না করিয়া আমাদের দেশী যন্ত্র করা যায় কিনা। নীচের দিকটা সারেঙ্গী কিংবা এস্রাজ যন্ত্রের নমুনা রাখিয়া উপরের খাড়াটা চন্দ্রসারংগের মত করিলে কিরূপ হয় চিন্তা করিয়া দেখিবে। নীচটা পাতলা তক্তা দ্বারা করিতে হইবে, যাতে বড় আওয়াজ হয়। তারপর বেহালার পরিবর্তে এসরাজ। এক হাত দেড়হাত লম্বা। পিয়ালি খাড় মোটা হইবে। যাতে চড়া স্বর

Dhaka University Institutional Repository

বেহালার মত হয়। এরূপ করিয়া এসরাজ তৈয়ার করিতে হইবে। দ্বিতীয় চন্দ্রসারং হইবে, বেসের জন্য বড় এসরাজ কিম্বা সারেঙ্গী হইবে। .. .. এসব তৈয়ার করিবার জন্য একটু চিন্তা কর। আমি তোমার নিকটে আসিয়া এসব চিন্তা করিয়া দেখিব। .. .. বেসের জন্যই চিন্তা। এ যদি করিয়া দিতে পার তবে আমার ইচ্ছা খোদা পূরণ করিবেন। আমি যাহা কিছু লিখিলাম প্রাণের আবেগে। তুমি চিন্তা করিবে। তোমার মাথা আছে। প্রথমে ক্ষতি করিলে পরে লাভ হইবে। ছবি আঁকিয়া দিলাম। যে নমুনাটি পছন্দ হয় তাহাই করিতে চেষ্টা করিবে। বেহালার মত পৃথক পৃথক কাঠের দ্বারা উপরে ও নীচে বেহালার মত তক্তা দিয়া করিতে হইবে। ইহাতে খুব মোটা তার লাগে। " [১০]

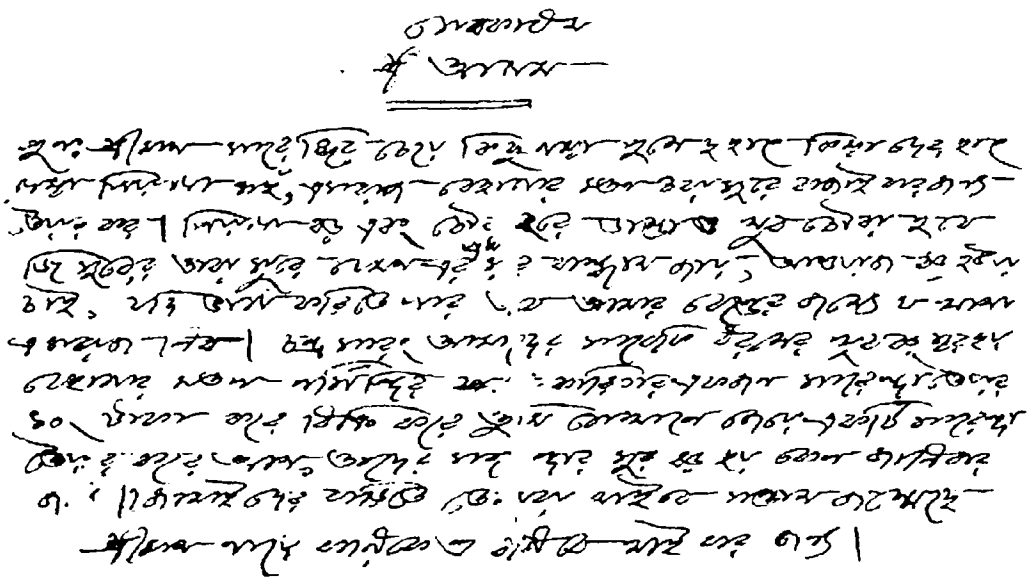

চিত্র-৭৮ ঃ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের লেখা আরেকটি চিঠির অংশবিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

"পুনঃ, শ্রীমান, সারেঙ্গীর চাইতে কিছু লম্বা পৌনে দুই হাত কিংবা দেড় হাত লম্বা পিয়ালা সহ এসরাজ বেহালার মতন চড়া সুরে বাজাইবার জন্য তৈরি কর। পিয়ালা বড় ও চওড়া হইবে। ডাণ্ডাও খুব চওড়া হইবে। 'জি' সুরের 'তারা' সুরে যেমন প্রথম সুর বাঁধা যায়। আওয়াজ বড় হওয়া চাই। যদি ভাল করিতে পার তবে আমার ব্যাণ্ডের জন্য আটখানা এসরাজ নিব। চন্দ্রসারঙ্গের স্বর আমাদের সাবেকী ধরণের খুব বড় ও বেহালার মত হওয়া চাই।" [১১]

Dhaka University Institutional Repository

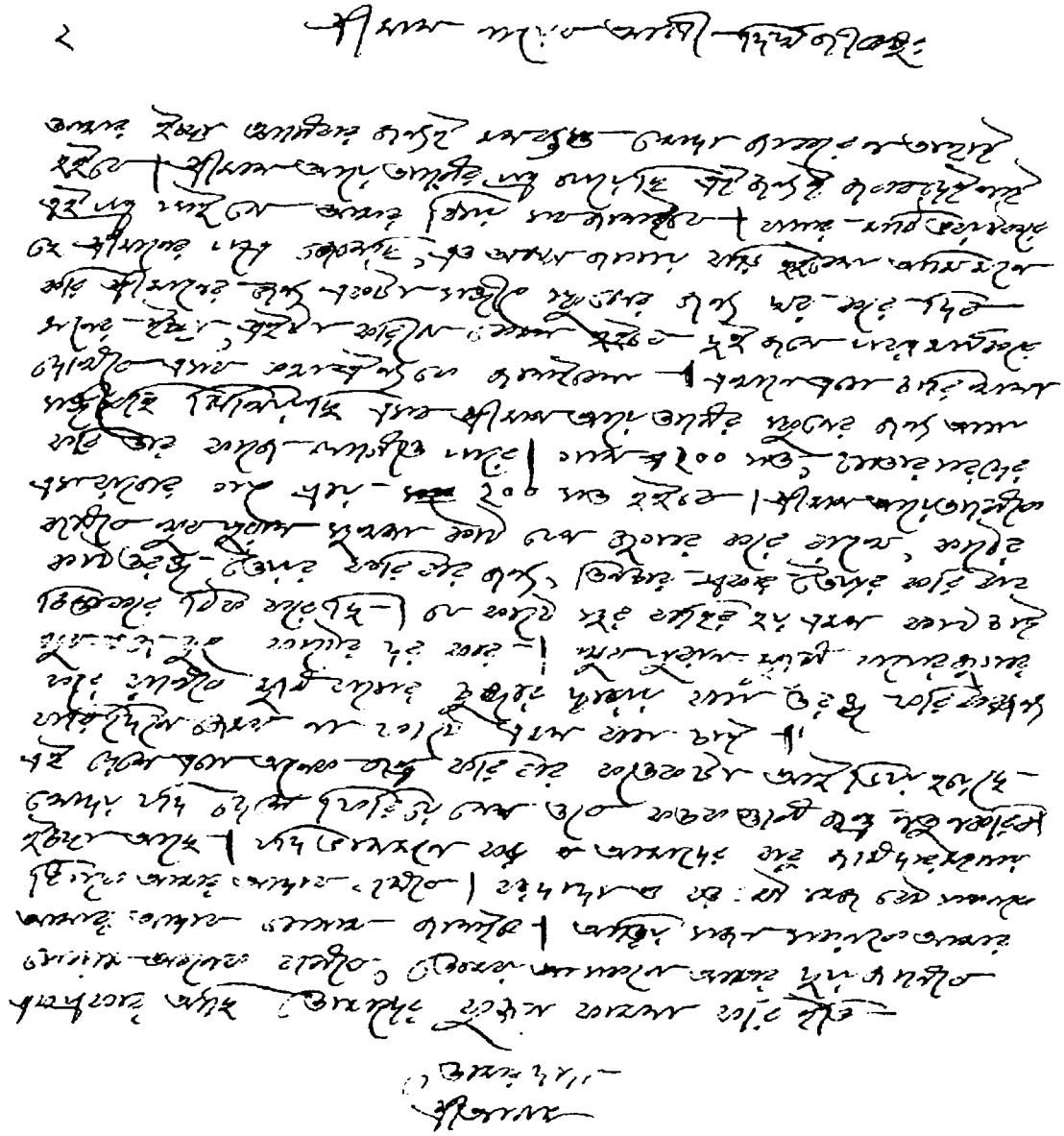

চিত্র-৭৯ ঃ পরিকল্পিত বাঁশ-তরঙ্গ সম্পর্কে লেখা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের চিঠি

"আয়েত আলীকে বলিবে খুব পুরানো শুকনো কাঠ যেন যোগাড় করিয়া রাখে। কাঠের 'কাঠ-তরঙ্গ' তৈয়ার করিবার জন্য। তিন চার প্রকারের চিন্তা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। যে কাঠে সুর বাহির হয় এমন কাঠ চাই। খুব মজবুত কাঠের দরকার। খুব পুরানো মুলি বাঁশ যোগাড় করিয়া রাখিবে। মুলি বাঁশের চোঙার দ্বারা 'বাঁশ-তরঙ্গ' করিবার জন্য। বাড়ি দিলে যেন না ফাটে এমন বাঁশ চাই।

এই দেশে আসিয়া অনেক যন্ত্র করিবার কতকটা আইডিয়া হইয়াছে। খোদা যদি দেশে ফিরাইয়া নেন তবে কতকগুলো যন্ত্র করিবার ইচ্ছা আছে। অবশ্য তোমরা যদি ভাল মনে কর।"[১২]

Dhaka University Institutional Repository

'সুরশ্রী' –

চিত্র-৮০ ঃ ড.মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

দোতারা জাতীয় তত যন্ত্রের একটি আধুনিক ও পরিমার্জিত রূপ হচ্ছে সুরশ্রী। দোতারা এবং নকুল বীণার সম্মিলনে নতুন এই যন্ত্রটির আবিস্কর্তা ড.মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। তিনি এর নামকরণ করেছেন সুরশ্রী। প্রাচীন ভারতে দুই তার বিশিষ্ট এক ধরণের বীণা ছিল, যার নাম নকুল বীণা। এই যন্ত্রের প্রভাব বজায় রেখে বাংলাদেশের অত্যন্ত পরিচিত একটি লোকজ বাদ্যযন্ত্র দোতারার পরিমার্জিত নতুন একটি সংস্করণ আবিস্কার করেছেন ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। যন্ত্রটি দোতারার মত ছোট আকারের হলেও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে অনেকটা নকুল বীণার মত। যন্ত্রের মূল অংশটি কাঁঠাল কাঠের তৈরি একটি শব্দ প্রকোষ্ঠ। এর সঙ্গে যুক্ত নাতিদীর্ঘ ফিংগারবোর্ড। ফিংগারবোর্ডে ধাতব পাত লাগানো থাকে। এর শেষ অংশে পেগবক্স যা দেখতে দোতারার মতই। যন্ত্রে চারটি স্টিলের তার ব্যবহৃত হয়। তারগুলো যথাক্রমে ম,স, প এবং র স্বরে বাঁধা হয়। ডান হাতে জওয়ার সাহায্যে তারে আঘাত করে এই যন্ত্র বাজাতে হয়। যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে দোতারার কাটা কাটা স্বরের পরিবর্তে টানা এবং সুরেলা শব্দ উৎপন্ন হয়। যার ফলে এতে শুধু লোক সংগীত নয় বরং রবীন্দ্র সংগীত, আধুনিক গান, উচ্চাঙ্গ সংগীত ইত্যাদি সব ধরণের সুর পরিবেশন করা যায়।

সংগীত শিল্পী এবং সংগীত গবেষক ড.মৃদুলাকন্তি চক্রবর্তীর জন্ম সুনামগঞ্জে, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭২ সাল থেকে বেতারে তিনি নিয়মিত রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করতে শুরু করেন। 'বিশ্বভারতী' থেকে "বাংলা সংগীতের ধারা ও লোকসংগীতের সুরে রবীন্দ্র সংগীত" বিষয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি লাভ করেন ১৯৯৪ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিভাগ স্থাপনে তাঁর ব্যাপক অবদান। বর্তমানে তিনি এই বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন।[১৩]

.. ..